গণেশ লালওয়ানী

শ্রীজৈন ভবন
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
চৈত্রশুক্লা ত্রয়োদশী
সন ১৩৪৪ সাল।

প্রকাশক
শ্রীমতিচাঁদ ভুরা
সচিব
শ্রীজৈন ভবন
পি ২৫ কলাকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

চিত্রকর্ম ও প্রচ্ছদ
শ্রীসুপ্রকাশ সেন

মুদ্রক
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

—তিন টাকা—

উগ্‌গং চ তবোকম্মং

বিসেসও বদ্ধমাণস্‌স

সূচীপত্র

১। সম্মেতশিখর ৫

২। দেলওয়াড়া ১২

৩। শত্রুঞ্জয় ১৯

৪। গিরনার ২৬

৫। শ্রবণ বেলগোল ৩৩

৬। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ৪০

৭। পাওয়াপুরী ৪৭

॥ নমো তিংথঅ ॥

তীর্থকে নমস্কার

দেলওয়াড়া
গিরনার
শত্রুঞ্জয়
পাওয়াপুরী
সম্মেতশিখর
উদয়গিরি-খণ্ডগিরি
শ্রবণ বেলগোল
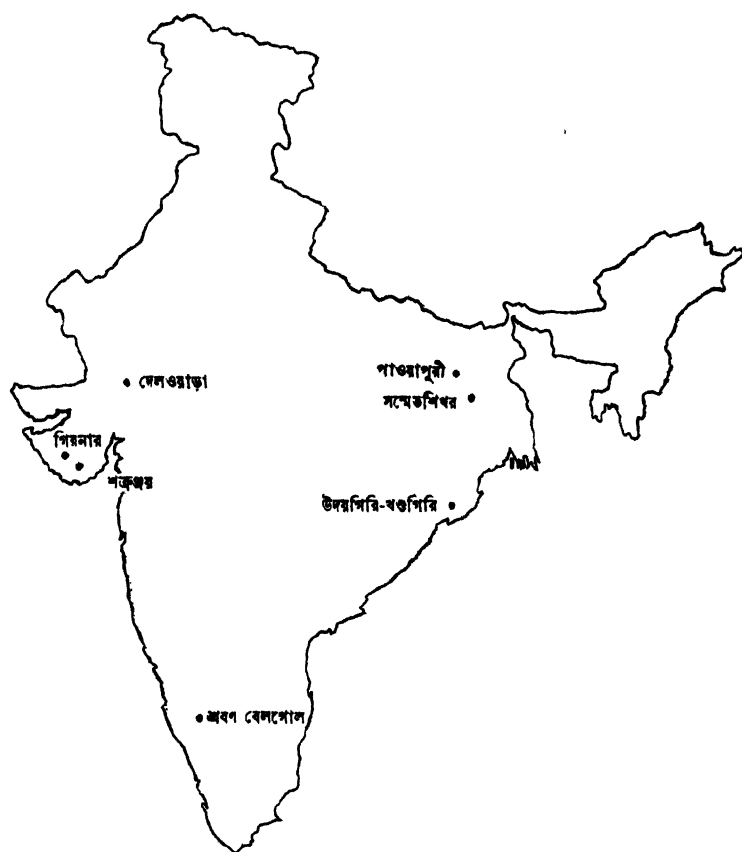
ভূমিকা

তীর্থ আমরা তাকেই বলি যেখানে গেলে আমাদের আত্ম-বিস্তৃতি হয়, ভাব-বিস্তৃতি।

এ অর্থে গুরুও তীর্থ, আচার্যও তীর্থ। তীর্থই। কারণ তাঁদের সান্নিধ্যে আমাদের আত্ম-বিস্তৃতি হয়, ভাব-বিস্তৃতি। আমরা আমাদের নিজের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যাই। জৈনরা এই জন্যই তাঁদের সকল সাধু ও সাধ্বীদের তীর্থ বলেন। জঙ্গম বা সচল তীর্থ।

সকল সাধু বা সাধ্বী সচল তীর্থ হলেও, আমরা যে অর্থে সাধারণ তীর্থ কথার ব্যবহার করে থাকি, তাঁদের দেহাবসানের পরে সেই স্থাবর তীর্থের সৃষ্টি হয় না বা সাধু-সাধ্বী ও শ্রাবক-শ্রাবিকার সংঘ-রূপ জঙ্গম তীর্থেরও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন না। তাঁদের প্রভাব একটা বিশেষ দেশ-কালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক আধ জন মহাপুরুষ আসেন, যাঁদের

প্রভাব দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। তাঁরা একটী বিশেষ সময়ে বিশেষ জায়গায় জন্মগ্রহণ করেও সকল দেশের সকল কালের। যেমন ভগবান ঋষভ, পার্শ্ব, কি মহাবীর। মহাবীর কবে ক্ষত্রিয়কুণ্ডপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাণী তাঁর জীবন আজো আমাদের আলো দেয়, অন্ধকারে পথ দেখায়। এঁদের আমরা তীর্থঙ্কর বলি। তীর্থঙ্কর এই কারণেই যে তাঁদের জীবিত-কালে সচল তীর্থ হয়েও তাঁরা পরবর্তীকালের জন্য যেমন সাধু-সাধ্বী ও শ্রাবক-শ্রাবিকার সঙ্ঘ-রূপ জঙ্গম তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি তাঁদের চ্যবন (গর্ভ প্রবেশ), জন্ম, দীক্ষা, কৈবল্য ও নির্বাণ-স্থান আমাদের কাছে স্থাবর তীর্থে পরিণত হয়। পরিণত হয় কারণ সেখানে গেলে তাঁদের উপদিষ্ট বাক্যের আমাদের মধ্যে উদ্দীপন হয়। এই উদ্দীপনায় আমরা নিজের সঙ্কীর্ণ সীমাকেই অতিক্রম করে যাই।

জৈন শাস্ত্রে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা আছে। এই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের চ্যবন, দীক্ষা, কৈবল্য ও নির্বাণভূমি জৈনদের কাছে তাই কল্যাণ-তীর্থ রূপে পরিগণিত। এই কল্যাণ-তীর্থের সংখ্যাই অসংখ্য। তার ওপর যদি তাঁদের বিচরণ-ভূমির তালিকা সেই সঙ্গে যোগ করা হয় তবে সে সব তীর্থের সীমাসংখ্যা থাকে না। তারপর পরবর্তীকালে যেখানে যেখানে মন্দির উঠেছে, কি চৈত্য, সাধু-সাধ্বীদের জন্য গুম্ফা নির্মিত হয়েছে, কি শিক্ষাদানের জন্য শিলালেখ, সেও সহস্র মানুষের ভাবনায়, ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় আজ তীর্থ হয়ে উঠেছে। সে অর্থে কোথায় জৈন তীর্থ নেই? এই গোটা ভারতবর্ষটাই একটা তীর্থ। তাই সমস্ত জৈন তীর্থের পরিচয় এই ছোট্ট পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, এবং সে চেষ্টাও আমরা করব না। আমরা এখানে সাতটি জৈন তীর্থের কথা বলব—যাদের নিজেদের এক একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম

সম্মেতশিখরের কথা। সম্মেতশিখর কুড়িজন তীর্থঙ্করের নির্বাণ-ভূমিই নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও অনুপম। দ্বিতীয় দেলওয়াড়া। দেলওয়াড়ার স্থাপত্যকীর্তি বিশ্ববিশ্রুত। তৃতীয় শত্রুঞ্জয়। শত্রুঞ্জয় মন্দির-নগরী, প্রাচ্যের গৌরব। চতুর্থ গিরনার। গিরনার সিদ্ধভূমি। অশোকের সময়ের আগেও এখানে মানুষ তীর্থযাত্রা করত। পঞ্চম শ্রবণ বেলগোল। পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি বলতে মিশরের রামেসিস মূর্তির কথাই আমাদের মনে আসে। কিন্তু তার চাইতেও বৃহৎ মূর্তি রয়েছে এই ভারতবর্ষের মাটিতেই---শ্রবণ বেলগোলের গোম্মটেশ্বর মূর্তি। ষষ্ঠ উদয়গিরি-খণ্ডগিরি। উদয়গিরি-খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলো আজ নীরব হলেও এক সময় সাধু-সাধ্বী ও শ্রাবক-শ্রাবিকাদের কলকণ্ঠে মুখরিত ছিল। সপ্তম পাওয়াপুরী। মহাবীরের নির্বাণ স্থান। যেমন শান্ত, তেমনি মনোরম।

তথ্য-সংগ্রহ আমাদের উদ্দেশ্য নয় যতটা কি সাধারণের মনে জৈন তীর্থ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগানো। কৌতূহল যদি একবার জাগ্রত হয়, তথ্য-সংগ্রহ তখন কিছু কঠিন হয় না। মানুষ তখন নিজের তাগিদেই তথ্য সংগ্রহ করে।
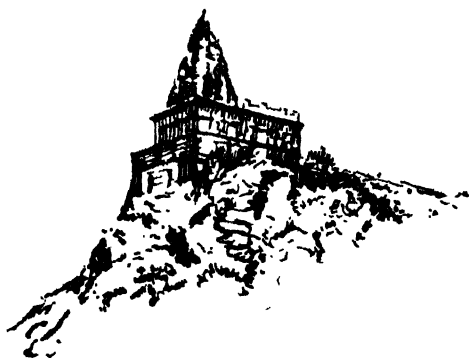
এক

সম্মেতশিখর

কল্যাণ-তীর্থ হিসেবে প্রথমেই যদি কারু নাম করতে হয় ত সম্মেতশিখরের। ক্ষত্রিয়কুণ্ড নয় কি পাওয়া, অযোধ্যা কি কৈলাস। ক্ষত্রিয়কুণ্ড শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মভূমি, পাওয়া নির্বাণস্থান। অযোধ্যায় প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কৈলাসে নির্বাণ। তবু সম্মেতশিখরের এই মান্যতা। তার কারণ, এক আধ জন তীর্থঙ্কর নয়, কুড়িজন তীর্থঙ্কর এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব চন্দ্রপ্রভ, সুবিধি, শীতল, শ্রেয়াংস, বিমল, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্থু, অর, মল্লি, মুনিসুব্রত, নমি ও পার্শ্ব। তাই মহাবীর ও ঋষভ, বাসুপূজ্য ও নেমি ছাড়া সম্মেতশিখর আর সকলের নির্বাণভূমি। বাসুপূজ্য চম্পায় নির্বাণ লাভ করেন আর নেমি গিরনার পাহাড়ে। সম্মেতশিখর জৈনদের কাছে যে এত পবিত্র তার কারণই এই।

কুড়িজন তীর্থঙ্কর ছাড়াও সম্মেতশিখরে আরো অনেক মুনি ও

সাধু নির্বাণ লাভ করেন। তাই বহুল সংখ্যক জৈন তীর্থযাত্রীরা সম্মেতশিখরের যাত্রা করে থাকেন। সম্মেতশিখরে আসতে পারা, বিশেষ করে পাহাড়ের ওপরের মন্দির দর্শন—সে অনেক ভাগ্যের ফল।

সম্মেতশিখর বলায় হয়ত চিনতে অসুবিধে হচ্ছে—কিন্তু যদি বলি পরেশনাথ পাহাড়। পরেশনাথ পাহাড়েরই প্রাচীন নাম সম্মেতশিখর। অনেক প্রাচীন। প্রাচীন সাহিত্যে সম্মেতশিখরের উল্লেখ আছে বলেই নয়, যে কুড়িজন তীর্থঙ্করের এটি নির্বাণভূমি তাঁরা সকলেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের। অবশ্য পার্শ্বকে এখন আর প্রাগৈতিহাসিক বলা যায় না। তাহলেও সম্মেতশিখর প্রাগৈতিহাসিক বৈকি!

কিন্তু সম্মেতশিখর যত প্রাচীন, সম্মেতশিখরের মন্দির তত প্রাচীন নয়। সম্মেতশিখরের কথা অনেক কালই মানুষ ভুলে গিয়েছিল, যেমন ভুলে গিয়েছিল কোথায় বৃন্দাবন ছিল, কি অযোধ্যা। বৃন্দাবনকে মাধবেন্দ্র পুরী আবিষ্কার করেছিলেন, অযোধ্যাকে রাজা বিক্রমাদিত্য। এমনি পরবর্তীকালে সম্মেতশিখরকেও আবিষ্কার করতে হয়েছে, শাস্ত্র-লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে। মন্দির উঠেছে তারও পরে। যে পথে পার্শ্বনাথের মন্দিরে যেতে হয় সে পথ তৈরী হয়েছে মাত্র ১৮৭৪ সালে। তাই তার আগে তীর্থযাত্রীরা এখানে বেশী আসতেনই না, সাধু ও শ্রমণ ছাড়া। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে রাজগৃহকে তাই যত প্রাচীন মনে হয়, সম্মেতশিখরকে তত প্রাচীন মনে হয় না।

কিন্তু তা না হলেও ভারী মনোরম সম্মেতশিখরের পরিবেশ। এখানে তপোবনের আবহাওয়া, দিব্যচেতনার অনুরণন। সেই অনুরণন এখানে এলেই অনুভব করা যায়।

সম্মেতশিখরে আসবার দু'টী পথ রয়েছে। একটা নিমিয়াঘাটের

দিক হতে, অন্যটা মধুবনের। নিমিয়াঘাট ষ্টেশন পূর্ব রেলওয়ের গয়া-হাওড়া লাইনে অবস্থিত। মধুবনে আসতে হয় তার আগের পরেশনাথ ষ্টেশনে নেমে। ষ্টেশন হতে দূরত্ব চোদ্দ মাইল। বাস আছে। গিরিডি হতেও মধুবনে আসা যায়। বাসপথে কুড়ি মাইল। অনেকে গয়া হতেও এখানে এসে থাকেন—ইসরি হয়ে। ইসরি পরেশনাথ ষ্টেশনের কাছেরই একটা ছোট গ্রাম। তবে মধুবনের দিক হতে না উঠে নিমিয়াঘাটের দিক হতে ওঠাই ভালো। মধুবনের পথটা একটু খাড়াই হয় বলে সে পথে নামতে ততটা কষ্ট হয় না, যতটা কি উঠতে। তাই যাঁরা ওপরে যান তাঁরা সাধারণতঃ নিমিয়াঘাটের দিক হতে উঠে মধুবনের দিকে নেমে আসেন। তবে মধুবনেও একবার অবশ্যই আসা উচিত—মধুবনেও অনেক মন্দির আছে। এক অর্থে মন্দিরের গ্রাম এই মধুবন।

নিমিয়াঘাটের দিক দিয়ে উঠলে একটু হাঁটতে হয় বেশীই। ষ্টেশন থেকেই হেঁটে আসতে হয়। তবে গাছপালায় ঢাকা পথ। হাঁটতে কিছু খারাপ লাগে না। বাতাসে কেমন বনের গন্ধ ভাসে। সে গন্ধ কেমন যেন নেশা লাগায়। সেই আদিম অরণ্য আর পাহাড়। এখানকার প্রকৃতির রূপই আলাদা।

খুব ভোর ভোর অন্ধকার থাকতে থাকতেই পাহাড়ের পথে বেরুতে হয়। কারণ পার্শ্বনাথের মন্দিরে যেতে গেলে ছ'মাইল চড়াই, ছ' মাইল উৎরাই করে প্রায় বারো মাইল পথ পার হ'তে হয়। তার ওপর বিভিন্ন শিখরের মন্দিরগুলো যদি ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় ত চড়াই উৎরাই করে আরো ছ'মাইল। তারপর সন্ধ্যার আগেই আবার ফিরে আসতে হয়। আর কোনো কারণে নয়, রাত্রে এখানে পথ-হাঁটা নিরাপদ নয় তাই। পাথর আর খদ্ ত আছেই, তাছাড়া হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি পড়ে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়।

এখানকার অরণ্য গভীর, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাঘ এখানে থাকলেও বাঘে কখনো কাউকে নিয়েছে এমন শোনা যায়নি। বোধ হয় সে এই জায়গাটির প্রভাব। 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং বৈরত্যাগঃ'—যোগ দর্শনের এই সূত্রটী এখানে যেন সত্য হয়ে উঠেছে। যেখানে এতো এতো তীর্থঙ্কর, সাধু ও মুনি তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করেছেন সেখানে তা না হয়ে আর উপায় কি? তাই ভোরের আব্‌ছা আব্‌ছা অন্ধকারেই চলে আসুন মনে কোনো শঙ্কা না রেখে। দু'দিকের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলোকে যতই অন্ধকার মনে হোক না কেন মাথার ওপরের তারার ঝাঁক আপনাকে পথ দেখাবে। সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতায় কোথাও কোনো শব্দ নেই, এক ঝরণার জলের ঝরঝর শব্দ ছাড়া। ভারি মিষ্টি ঝরণার জলের কলধ্বনি।

নীচের ভালো পথটা হয়ত একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। তারপর আসবে ভাঙা পাথরের পথ, উঁচুনীচু, পাহাড়ের গা কেটে যা তৈরী হয়েছে। তবে ততক্ষণে দিনের আলোও ফুটতে আরম্ভ করেছে। ফরসা হতে আরম্ভ করেছে পূবের দিগন্ত। পথটা পাহাড়ী পথ যা হয়ে থাকে তাই। একদিকে খদ্। সে খদ্ ক্রমশঃই নীচে নেবে যাবে, যতই ওপরে উঠবেন। কিন্তু কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে সেই খদ্‌কে, যেন নীল কুয়াসার একটা স্বপ্ন। মাথার ওপর আকাশের গায়ে ততক্ষণে লাল লাল রেখা টানা হয়েছে। বোধ হয় পাহাড়ের আড়ালে সূর্যোদয় হচ্ছে।

এভাবে ওপরে উঠতে থাকুন। পথের দু'পাশে দেখবেন কত গাছ, কত ঝাড়, কত লতা, কিছু যার চেনা কিছু অচেনা। আম গাছ দেখবেন দু'টী একটী, আর সরু বাঁশের ঝাড়। বন-কদলীও চোখে পড়বে। পায়ের তলায় মুর মুর করবে ঝরা শুকনো পাতা। বনের পাখীরা সাড়া দিয়ে ফিরবে। তারপর রোদ তাতিয়ে উঠবার

আগেই বেলা আটটা ন'টার মধ্যে এসে যাবেন পাহাড়ের ওপরের ডাকবাংলোয়। পার্শ্বনাথের মন্দির আর দূরে নাই, মাত্র আধ মাইল।

মন্দিরের জন্য নয়, কিন্তু যদি থাকতে ইচ্ছে করে পাহাড়ের ওপর তবে থেকেও যেতে পারেন এই ডাকবাংলোয় এক আধ দিন। তবে সেক্ষেত্রে খাবার দাবার আপনাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসতে হবে। এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। জ্বালানি কাঠ বন হতে সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে সেদিন সেখানে বিশ্রাম নিতে পারেন, পরদিন দেখবেন মন্দির। শুধু পার্শ্বনাথের মন্দিরই নয়, অন্যান্য শিখরের মন্দির—গৌতম স্বামীর, অভিনন্দন স্বামীর, চন্দ্রপ্রভুর। অধিত্যকার জল-মন্দিরটিও। মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে সুন্দর একটী জলের ঝিল—মানুষের তৈরী। তা না হলে ডাকবাংলোর বারান্দায় একটু বিশ্রাম নিয়েই উঠে পড়ুন। অনেক দেখবার আছে, অনেক ঘুরবার। আর সে সমস্ত যদি না পারেন বা সে ইচ্ছা না থাকে তবে সোজা চলে আসুন পার্শ্বনাথের মন্দিরে।

এখন পথ আরো সঙ্কীর্ণ, আরো ভাঙা-ভাঙা। যদি বৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে ত পিচ্ছিল। বৃষ্টি এখানে প্রায়ই হয়। বোধ হয় খুব উঁচু বলেই।

সম্মেতশিখরের উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট—এদিকের সব চাইতে উঁচু পাহাড়। ওপরে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন চারদিকের সুন্দর দৃশ্য—পাহাড়ের সার। দূরে ঝিল। যমনৈয়া সাদা সুতোর মতো বেষ্টন করে আছে এই পাহাড়টিকে। আরো দেখবেন হরিতে হিরণে সুন্দর পৃথিবীকে—ওপরে হয়ত তখন মেঘের ঘনঘটা নীচে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি।

পথ শেষ হয়ে গেছে মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে এসে। তবু হয়ত মন্দিরটি তখনো মেঘে মেঘে অস্পষ্ট। হয়ত বিন্দু বিন্দু ঘামের

মতো জল ঝরে রয়েছে সমস্ত মেঝেতে। নয়ত প্রখর সূর্যালোকে সমস্ত।কছু উদ্ভাসিত। আকাশের রঙ নীল।

মন্দির দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আশ্চর্য এর নির্মাণ কৌশল। আর কত ওপরে।

সেই সঙ্গে ভগবান পার্শ্বের কথাও আপনার মনে না পড়ে পারবে না। মনে পড়বে যেদিন তিনি সকলকে বারাণসীর বহির্উদ্যানের দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন এরা সব কোথায় চলেছে—সেদিনের কথা। কোথায় আবার? ঐ যে কমঠ নামে এক সন্ন্যাসী এসেছে, তারি কাছে। শুনে কুমার পার্শ্বের মনেও কৌতূহল হল। তিনিও গেলেন কমঠের পঞ্চাগ্নি তপ দেখতে। কিন্তু কি দেখলেন? দেখলেন আগুনে কেবল কাঠই পুড়ছে না, পুড়ছে একজোড়া সাপও। অজ্ঞানকৃত সেই তপস্যা। তবুও থাকতে পারলেন না পার্শ্ব। তাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, জানোনা হিংসায় কখনো ধর্ম হয় না। ধর্মের মূল অহিংসা, দয়া।

কিন্তু পঞ্চাগ্নি তপে হিংসা কোথায়?

পার্শ্ব টেনে বার করলেন সেই অগ্নিকুণ্ড হতে একটী কাঠ। কাঠটিকে দু'খণ্ড করতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আধ-পোড়া একজোড়া সাপ।

এই জীবে দয়া—অহিংসাই জৈন ধর্মের মূল কথা। এই অহিংসা প্রচার করবার জন্যই গৃহত্যাগ করলেন কুমার পার্শ্ব। প্রব্রজ্যা নিলেন—করলেন চতুর্বিধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। তারপর অন্তিম সময়ে এই সম্মেতশিখরে এসে অনশনে নির্বাণ লাভ করলেন।

মন্দিরের ভেতর শ্বেত-পাথরের বেদী। বেদীর ওপর ভগবান পার্শ্বের চরণ-চিহ্ন। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই মহাজীবনকে স্মরণ করে মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে, প্রণাম না করে আপনিও পারবেন না।

এখানে সব মন্দিরেই এই চরণ-চিহ্ন। এক অধিত্যকার জল-মন্দির ছাড়া। সেখানে তীর্থঙ্করদের পাথরের মূর্তি রয়েছে।

যে পথ দিয়ে ওপরে উঠেছিলেন, সেই পথ দিয়েই নেমে আসুন। ডাকবাংলোয় খানিক বিশ্রাম নিন্। তারপর রোদ পড়লে মধুবনের পথ ধরুন। উৎরাই বলে নেমে আসবেন একটু তাড়াতাড়িই।

মধুবনের কাছাকাছি আসতে পাবেন জলের ঝরণা আর বিশ্রাম ঘর। কিন্তু বিশ্রাম নেবার দরকারই হবে না—মধুবন আর দূরে নেই। তাছাড়া ততক্ষণে হয়ত নামতেও সুরু করেছে সবখানে সন্ধ্যার এক অন্ধকার। আকাশে ফুটতে আরম্ভ করেছে দু'টী একটী তারা। মধুবনেও হয়ত আলো জ্বলেছে।

পা দুটো সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়েছে, কিন্তু মন? মনে সন্ধ্যা-তারার সেই প্রশান্তি, যে প্রশান্তি সবখানে আপনি খুঁজে বেড়ান অথচ কোথাও যা পান না।
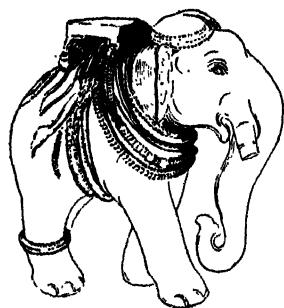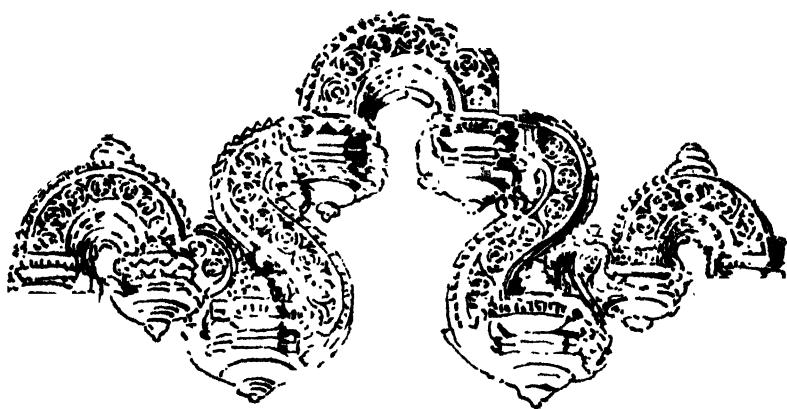
দুই

দেলওয়াড়া

কোথায় সম্মেতশিখর আর কোথায় দেলওয়াড়া! প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু এ ব্যবধান শুধু দেশগত নয়, কালগতও। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা নয়, ঐতিহাসিক যুগের গোড়ার দিকে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল পূর্বাঞ্চলেই বেশী। এর কারণও যে না ছিল তা নয়। কারণ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের বিচরণ-ক্ষেত্রই ছিল প্রধানতঃ বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কোনো কোনো অংশ। বাংলাদেশের সঙ্গে জৈন ধর্মের সম্পর্ক যে কত প্রাচীন তার নিদর্শন মানভূম জেলার বোড়াম, ছড়রা এবং পাড়ার জৈন মন্দির ও ধ্বংসস্তূপগুলো। প্রবাদ সে-গুলো মহাবীরের ভক্ত-শিষ্যদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কেউ কেউ এদের পার্শ্বনাথের সময়ের বলেও অভিহিত করেন। তাহলে এদের কাল দাঁড়ায় খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী। এখানে সেকালে যাঁরা

জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 'সরাক' (শ্রাবক শব্দের অপভ্রংশ) নামে আজো তাঁরা পরিচিত। কিন্তু সে যা হোক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে জৈন ধর্মকে ক্রমশঃই পূর্বাঞ্চল হতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে সরে যেতে হয়েছে। বলতে কি জৈন ধর্মের প্রসার আজ পশ্চিমাঞ্চলেই বেশী—গুজরাটে ও রাজপুতানায়। সম্মেতশিখরের কথাও যে মানুষ ভুলে গিয়েছিল সেও ওই কারণেই।

কিন্তু দেলওয়াড়াকে কেউ ভুলে যায়নি। দেলওয়াড়া অত প্রাচীন নয়, না কল্যাণ-তীর্থ। আবু পাহাড়ে কোনো তীর্থঙ্কর এসেছিলেন কিনা যেমন জানা নেই তেমনি জানা নেই খৃষ্টীয় দশ শতকের আগে এখানে জৈন শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল কিনা। তবে পরবর্তী কালে যে এখানে এসে জৈন সাধুরা থাকতেন তার প্রমাণ আছে। তাই আবুও এক হিসেবে তীর্থ। তাছাড়া আবুতে না এলে, দেলওয়াড়ার মন্দির না দেখলে জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটা বিরাট কীর্তির সঙ্গেই পরিচয় হয় না। শুধু তাই নয়, রূপ-কল্পনায় ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে দেলওয়াড়ার মন্দিরের কাছাকাছি আসে ভারতবর্ষেও এমন মন্দির বিরল! তাই এখানে জৈন তীর্থযাত্রীই নয়, আসেন পৃথিবীর দূর-দূরান্ত হতে আর এক ধরণের তীর্থযাত্রী, যাঁরা শিল্পী ও শিল্প-রসিক। দেলওয়াড়া তাই আর্টিষ্ট ও আর্টপিপাসুদেরও তীর্থক্ষেত্র।

দেলওয়াড়ায় আসা কিছুই শক্ত নয়। দ্বারকা যাবার পথে পশ্চিম রেলওয়ের দিল্লী-আমেদাবাদ লাইনে আবুরোড ষ্টেশন দেখে থাকবেন নিশ্চয়ই। সেখানে নেমে আবু পাহাড়ে চলে আসুন। ষ্টেশন হতে তার দূরত্ব সতের মাইল। তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাস ও পাকা সড়ক রয়েছে। বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছেই পাহাড়ের মাথায় হোটেল। এখান হতে দেলওয়াড়ার দূরত্ব আরো

এক মাইল। ওটুকু পথ হেঁটেই যাওয়া যায়। তাছাড়া দেলওয়াড়ার পাশ দিয়েই আবার বাস গেছে গুরুশেখর হয়ে অচলগড়ের দিকে। হিমালয় ও নীলগিরির মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাকি একটীও নেই। এর উচ্চতা ৫৬৪৬ ফুট। দেলওয়াড়াতেও ধর্মশালা ও যাত্রী-নিবাস আছে।

দেলওয়াড়ায় মোট পাঁচটি মন্দির আছে। তবে দেলওয়াড়ার খ্যাতি বিমল বসই ও বস্তুপাল-তেজপালের মন্দিরের জন্য। আর তিনটি মন্দির নিতান্তই সাধারণ।

বিমল বসই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ১০৩২ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠা করেন গুজরাটরাজ প্রথম ভীমদেবের মন্ত্রী বিমল শা'। বিমল শা' অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা হতে নিজের সাহস ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য রাজানুগ্রহ লাভ করে ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। বিমল বসই মন্দিরের একটি প্রাচীন লেখ হতে জানা যায় যে তিনি এক সময় চন্দ্রাবতীর এক ধন্ধুককে পরাজিত করে আবু অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। সেই কর্তৃত্ব লাভ করবার কিছুদিন মধ্যে তিনি মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত হন। অবশ্য এই মন্দির নির্মাণের পেছনে প্রত্যক্ষ উৎসাহ ছিল তাঁর গুরু ধর্মঘোষ সূরীর। ধর্মঘোষ সূরীই এই নবনির্মিত মন্দিরটিতে আদিনাথ বা ঋষভদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দির নির্মাণের কাজে বিমল শা' বারো কোটি টাকার ওপর ব্যয় করেছিলেন। কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ মন্দিরটির জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয় তা একজন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অসম্ভব মূল্যে কিনতে হয়েছিল। তার ওপর বিমল শা' সমস্ত মন্দিরটিকে মাকরানার শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন—যে পাথর দিয়ে পরবর্তী কালে আগ্রার তাজমহল তৈরী হয়েছিল। সেই পাথরকে অনেক দূর হতে আনতে হয়েছে। আর শুধু আনাই নয়, পাহাড়ের

মাথায় তোলা হয়েছে। কিন্তু কি ভাবে যে তোলা হয়েছিল সেও এক আশ্চর্য। তারপর কত সুদক্ষ কারিগরকে যে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল—তারো সীমাসংখ্যা নেই। কাজ এত সূক্ষ্ম যে দেখলে মনে হয় না এরা পাথর কুরে মন্দির তৈরী করেছে — মনে হয় সমগ্র মন্দিরটি যেন মোম দিয়ে তৈরী। তাই ছবিতে দেখা কিছু দেখা নয়, কানে শোনাও কিছু শোনা নয়, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না এমনি।

মন্দিরটি বাইরে থেকে দেখলে একটু নিরাশ হতেই হয়, কারণ মন্দির বলে একে মনে হয় না। একটা চার কোণা বাড়ী, খুব উঁচুও নয়, সুস্পষ্ট কোনো শিখরও নেই। কিন্তু একবার ভেতরে ঢুকলে একসঙ্গে রূপকথার রাজ্য অবারিত হয়ে যায়। তখন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা করে না যে এ সমস্তই মানুষের হাতে তৈরী। মনে হয় এ সব যেন সেই পুরাণ-প্রখ্যাত ময়দানবের কীর্তি।

ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে সে সার সার থাম আর বন্ধনীর আকারে খিলান। খিলানগুলো তু'দিকে বিস্তৃত—তাই আর্চের সৃষ্টি করেছে। এই খিলানের কাজগুলো ভারী সূক্ষ্ম। এ রকম খিলানযুক্ত আটচল্লিশটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মণ্ডপটি। শ্বেত পাথরেরই মণ্ডপ। এই মণ্ডপটিকে ঘিরে চারদিকে ছোট ছোট বাহান্নটি কুঠরী। এই সব কুঠরীতে তীর্থঙ্করদের পদ্মাসন মূর্তি রয়েছে। মূর্তিগুলো সমস্তই এক ধরণের তাই লাঞ্ছন* না দেখে চিনবার উপায় নেই কোনটি কার। কুঠরীগুলোর সামনে সঙ্কীর্ণ একটা গলিপথ। মুখ্য মন্দিরে ভগবান আদিনাথের প্রমাণাকার

---

* লাঞ্ছন অর্থে প্রতীক চিহ্ন। চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের লাঞ্ছন যথাক্রমে: বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, বক, পদ্ম, স্বস্তিকা, চন্দ্র, মকর, শ্রীবাস্তব, গণ্ডার, মহিষ, বরাহ, ঈগল, বজ্র, হরিণ, মেষ, নন্দীবর্ত, কলস, কূর্ম, পদ্মপত্র, শঙ্খ, সর্প ও সিংহ। মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে পাথরের গায়ে এই চিহ্নগুলো উৎকীর্ণ থাকে।

মূর্তি। এক মেঝে ছাড়া এখানে আর কোথাও কোনো ফাঁক নেই। সবখানে পাথর কুরে মূর্তি বার করা হয়েছে, নয়ত সূক্ষ্ম কাজ। মন্দিরের গায়ে, পাথরের থামে, থামের খিলানে, এমন কি ছাদেও। তবে এই অলঙ্করণ এলোপাথাড়ি নয়, সবটা মিলিয়ে সুসমঞ্জস। কোথাও পদ্মের ঝাড় নেমেছে ত কোথাও নৃত্যগীত হচ্ছে। এরই মধ্যে জৈন পুরাণ বা তীর্থঙ্করদের জীবন-কাহিনী পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ। সব চেয়ে আশ্চর্য সুন্দর মণ্ডপের ছাদ। তার বর্ণনা করি এমন ভাষা নেই। ধর্ম মানুষকে কতখানি অনুপ্রাণিত করলে এই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব!

মণ্ডপের ছাদে গোল করে ঘিরে ব্র্যাকেটের মতো যে ষোলটি মূর্তি রয়েছে সেগুলো জৈন পুরাণের ষোলটি বিদ্যার। এঁদের নাম: রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রাঙ্কুশা, অপ্রতিচক্রা, পুরুষদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী গান্ধারী, সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা, মানবী, বেরোট্যা, অচ্ছুপ্তা, মানসী ও মহামানসী।

বিমল বসই মন্দিরের কাছে যে হাতীশাল রয়েছে তাও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কোণারকের হাতীর কথাই সকলের জানা আছে কিন্তু এখানকার হাতীও জীবন্ত এবং প্রমাণ আকারের। হাতীর পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাওদা ও শিকল পাথরের হলেও মনে হয় যেন সত্যিকারের। এ সব হাতীর পিঠে এককালে মূর্তি বসানো ছিল এবং সেগুলো সমস্তই বিমল শা'র পরিবার পরিজনের। কিন্তু সেই মূর্তিগুলো এখন অপসৃত হয়েছে।

বিমল বসই মন্দিরের ঠিক গায়েই বিরধবলের মন্ত্রী দু'ভাই বস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি ভগবান অরিষ্ট নেমির এবং বিমল বসই মন্দিরের দু'শ বছর পরে নির্মিত হলেও সেই মন্দিরেরই অনুকরণে। বস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১২৩২ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দিরটিও বিমল বসই মন্দিরের মতো সম্পূর্ণ ই

মাকরানার শ্বেত পাথরে তৈরী। তবে এই মন্দিরের কাজ আরো সূক্ষ্ম। পদ্মের পাঁপড়িগুলোকে এখানে সত্যিকারের বলে ভুল হয়।

গল্প আছে, তেজপাল কারিগরদের কাজ শেষ হলে পদ্মের পাঁপড়ি দেখে বলেছিলেন যে, যারা এ থেকে যে পরিমাণ পাথর ঘঁষে বার করে দেবে তিনি তাদের সেই পরিমাণ সোনা দেবেন। তাই পদ্মের পাঁপড়ি এত স্বচ্ছ। আর মণ্ডপের ছাদ? সে ত ছাদ নয়, পদ্মবন। সেখান হতে অসংখ্য আধফোটা পদ্মফুল নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে।

বস্তুপাল চরিতের লেখক জীন হর্ষগণি দেলওয়াড়ার এই মন্দিরটি তেজপালের স্ত্রী অনুপমা দেবীর উৎসাহে নির্মিত হয়েছিল বলে অভিহিত করেছেন। যখন তাঁরা মন্ত্রীত্ব লাভ করেন নি তখন তাঁরা এক সময় সৌরাষ্ট্রের তীর্থযাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে তাঁদের প্রভূত অর্থ ছিল। দেশের অরাজক অবস্থার জন্য সেই অর্থ নিয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া উচিত নয় মনে করে সেই অর্থের অধিকাংশই একটা গাছের নীচে পুঁতে রেখে যাওয়াই তাঁরা স্থির করেন। কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে তাঁরা আরো অনেক প্রোথিত স্বর্ণ লাভ করেন। এই প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে তাঁরা কি করবেন যখন স্থির করতে পারছিলেন না তখন অনুপমা দেবীই তাঁদের এই অর্থ আবু, শত্রুঞ্জয় ও গিরনারে মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যয় করবার উপদেশ দেন।

কিন্তু শুধু এই উপদেশটুকুই নয়, মন্দির নির্মাণের সময়ও তিনি মন্দির নির্মাণের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। এই মন্দির নির্মাণের কাজই প্রথম দিকটায় আশানুরূপ অগ্রসর হচ্ছিল না। তখন তিনি প্রধান স্থপতিকে তেজপালের সম্মুখে উপস্থিত হবার আদেশ দেন ও তার মুখে শিল্পীদের অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত হয়ে তা অবিলম্বে দূর করেন। তার ফলে মন্দির নির্মাণের কাজ আশাতীতরূপে দ্রুত অগ্রসর হয়।

বিমল বসই মন্দিরের মতোই এই মন্দিরের সংলগ্ন একটী হাতীশাল রয়েছে এবং হাতীগুলিও প্রমাণ আকারের ও জীবন্ত। এই সব হাতীর আরোহীরা এখানেও বিমল শা' মন্দিরের হাতীশালের আরোহীদের মতোই অপসৃত হয়েছেন। তবে হাতীশালের দেয়ালের প্রস্তর ফলকে ললিতা দেবী ও বিরুতা দেবী সহ বস্তুপাল এবং অনুপমা দেবী সহ তেজপালের মূর্তি খোদিত রয়েছে। একটী শিলা-লেখে অনুপমা দেবীর সৌন্দর্য, বিনয়, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার প্রশংসা করা হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তিনি এই প্রশংসার অধিকারিণী।

বস্তুপাল-তেজপালের মন্দিরের হাতীশাল আরো এক কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে ওপরের দিকে যে শ্বেত পাথরের জালি দেওয়া আছে তা একটু মোটা হলেও তাজমহল বা সেলিম চিস্তির কবরের জালির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

এ দু'টী মন্দির সম্বন্ধে তাই বেশী বললেও কিছু বলা হয় না। এখানে শিল্পীর কল্পনা যেমন রূপলোকে উধাও হয়ে গেছে, তেমনি সৃজনী প্রতিভার এ যেন এক চরমোৎকর্ষ। কিন্তু এত যে বৈচিত্র্য, লতায় পাতায় পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জীবনের যে চাঞ্চল্য তা কিন্তু কোথাও অতিরেক হয়ে যায় নি। সে যেন গানের আলাপের মতো সমে এসে বিধৃত। তাই এই উচ্ছ্বাস আন্দোলন সমস্তই যেন এক প্রশান্তিতে এসে শেষ হয়েছে, থেমে গেছে, যার প্রতীক তীর্থঙ্করের ধ্যান-সমাহিত প্রতিমূর্তি। এখানে এসে দাঁড়ালে তাই সেই প্রশান্তিকে অনুভব করা যায়, সেই ধ্যান-সমাহিতিকে। তখন আরো এক ভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয় সেই সমস্ত শিল্পীদের সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টির কথা মনে করে।

তিন
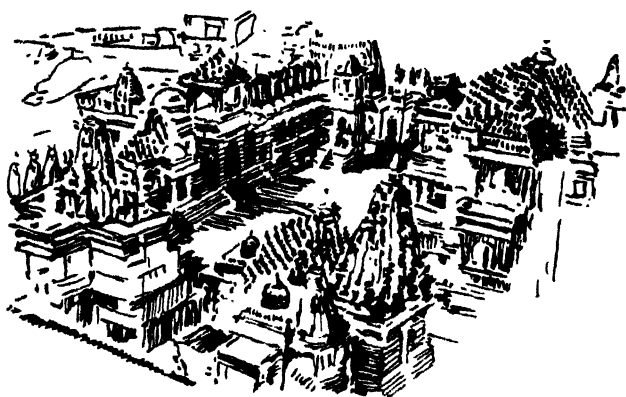
শত্রুঞ্জয়

পৃথিবীতে অনেক বড় মন্দির আছে, অনেক সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষেই আছে, দেলওয়াড়ার মন্দিরের কথাই ধরা যাক্ না কেন, কিন্তু মন্দির-নগরী বলতে যা বোঝায়—দু' দশখানা মন্দির নয়, একসঙ্গে প্রায় হাজার খানেক মন্দির, সে বোধহয় এক শত্রুঞ্জয় ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। শত্রুঞ্জয়ে ৮৬৩টি মন্দির আছে। আর মূর্তি? সে কে কবে গুণে দেখেছে। কম করেও কয়েক হাজার ত বটেই। তাই শত্রুঞ্জয় রূপকথার সেই স্বপ্নপুরী—যে পুরী পরিষ্কার দুধে ধোয়া ধব্‌ধব্। যে পুরীতে জনমানুষ নেই, সাড়াশব্দ নেই। পুরী নিঝুম—পাতাটি নড়ে না, কুটোটি পড়ে না। কারণ স্বপ্নপুরীর মতো জীবন্ত মানুষ ত এখানে বাস করে না—তীর্থঙ্করদের পাথরের মূর্তিই এখানকার একমাত্র অধিবাসী। এ যেন ব্যাবিলনের সেই শূন্যোদ্যান,—পৃথিবী ও আকাশের

মাঝখানের। স্বর্গ ও মর্ত্যের এই এক সীমারেখা। শত্রুঞ্জয়ের যে সৌন্দর্য সে এই সীমারেখারই সৌন্দর্য।

জৈনদের সকল তীর্থই প্রায় পাহাড়ের ওপর। সম্মেতশিখর আবু, শত্রুঞ্জয়, গিরনার ও অষ্টাপদ—কিন্তু কেন? পৃথিবী হতে অনেক দূরে যেখানে প্রত্যহের ধূলি-মলিনতা নেই, কল-কোলাহল নেই, সেইখানেই না চিত্তের প্রশান্তি, মনের বিস্তার। পাহাড়ে ওঠাই ত তাই অনেকখানি।

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast Silence.

—Ibsen

সেই নৈঃশব্দকে, সেই ধ্যান-সমাহিতিকে অনুভব করতে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে অনেক অনেক ওপরে উঠে আসতে হবে। ওপরে, আরো ওপরে, যেখানে পাহাড়ের শৃঙ্গ, তারার আলো আর অন্তঃহীন নৈঃশব্দ। শত্রুঞ্জয় মন্দির-নগরীর বিপুল নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই মহা-নৈঃশব্দকে যেমন অনুভব করা যায় তেমন বোধ হয় আর কোথাও নয়। শত্রুঞ্জয় তাই তীর্থের মধ্যেও আবার বিশেষ। দানে যেমন অভয়দান, গুণে বিনয়, তীর্থে তেমনি এই শত্রুঞ্জয়।

কল্যাণ-তীর্থ না হোক, শত্রুঞ্জয় সম্মেতশিখরের মতোই প্রাচীন। এমন কি সম্মেতশিখরেরও আগের। কারণ প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেব একাধিকবার এখানে এসেছিলেন ও বার্ষিক তপ করেছিলেন। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্য ও গণধর পুণ্ডরীক এই শত্রুঞ্জয়েই দীর্ঘদিন তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করেন। এখানে এতো এতো মুনি ও সাধু তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করেন

যে শত্রুঞ্জয়ে এমন একটী পাথর নেই যেখানে কোনো না কোনো সাধু বা মুনি নির্বাণ লাভ করেন নি। শত্রুঞ্জয় জৈনদের কাছে যে এত পবিত্র তার কারণও এই। পবিত্র বলেই শত্রুঞ্জয়ে অনেক সংখ্যক তীর্থযাত্রী এসে থাকেন। কার্তিক ও চৈত্র পূর্ণিমায় এবং অক্ষয় তৃতীয়ায় এখানে মেলা ও উৎসব হয়। সেই সময় এখানে বহু লোকের একসঙ্গে সমাগম হয়ে থাকে।

ভগবান ঋষভদেব সম্বন্ধে এখানে দু' একটী কথা বলে নিলে হয়ত তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ তিনি এই অবসর্পিনীর * প্রথম ধর্ম-প্রবর্তক বা তীর্থঙ্করই ছিলেন না, ছিলেন প্রথম কর্ম-প্রবর্তকও। সেজন্য তাঁকে আদিনাথ, আদিশ্বরও বলা হয়। এঁর আগে মানুষ লোকব্যবহার, কৃষি, বাণিজ্য কিছুই জানত না। রাজপদে অভিষিক্ত থাকা কালীন তিনিই সেগুলো তাদের প্রথম শিক্ষা দেন।

ভগবান ঋষভ বিনীতায় (বর্তমান অযোধ্যা) জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম ছিল নাভি, মায়ের নাম মরুদেবী। এঁর যখন বয়স তিন বছর, তখন একদিন ইন্দ্র এঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বিনীতায় এলেন। মহাপুরুষের কাছে যেতে গেলে বা রাজ সমীপে খালি হাতে যেতে নেই, কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। তাই ইন্দ্র হাতে করে একখণ্ড ইক্ষু নিয়ে এলেন। ঋষভ সেই ইক্ষু ইন্দ্রের হাত হতে গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি যে রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা

---

* জৈন শাস্ত্রে কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার ভাগে ভাগ না করে অবসর্পিনী ও উৎসর্পিনী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অবসর্পিনী অবনতির যুগ, উৎসর্পিনী ক্রমিক অভ্যুদয়ের। অনাদিকাল হতে অবসর্পিনীর পর উৎসর্পিনী এবং উৎসর্পিনীর পর অবসর্পিনী এভাবে কালচক্র প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। এই উৎসর্পিনী ও অবসর্পিনীর ছয়টি করে অর বা বিভাগ রয়েছে। জৈন মান্যতা অনুসারে প্রত্যেক অবসর্পিনী ও উৎসর্পিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ অরে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে নির্গ্রন্থ ধর্ম প্রচার করেন।

করলেন, তার নাম হল ইক্ষ্বাকু বংশ। বলা বাহুল্য ঋষভই এই অবসর্পিনীর প্রথম রাজা ছিলেন।

ঋষভদেবের দুই বিবাহ ছিল। সুনন্দা ও সুমঙ্গলা। সুনন্দার গর্ভে ভরত ও ব্রাহ্মী ও সুমঙ্গলার গর্ভে বাহুবলী ও সুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। এ ছাড়া সুমঙ্গলার গর্ভে আরো উনচল্লিশটি যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়।

ঋষভদেবের এই জীবনীর সঙ্গে ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে যে ঋষভদেবের চরিত্র আছে তার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সেখানে ঋষভদেবের পিতার নামও নাভি এবং মায়ের নাম মেরু। তাঁরও শত পুত্র ছিল, যাঁদের মধ্যে ভরত সকলের বড় ছিলেন। জৈন মান্যতা অনুরূপ ভাগবতে লিখিত আছে এই ভরত হতেই এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। শুধু তাই নয়, ভাগবতে আরো বলা হয়েছে যে 'শ্রমণানামৃষীণামূর্দ্ধমন্থিনাং' অর্থাৎ শ্রমণ ও উর্দ্ধরেতা মুনিদের ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। এতে মনে হয় এই দুই ঋষভ একই ব্যক্তি ছিলেন। 'কৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ'—মানুষকে কৈবল্য বা মোক্ষমার্গের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর আসা—ভাগবতের এই উক্তি হতে সে ধারণা আরো দৃঢ় হয়। তাই ভগবান ঋষভ জৈনদেরই একমাত্র নমস্য নন্, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বীদেরও। কারণ ভাগবতে এই ঋষভদেবকে ভগবানের অংশাবতার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

শত্রুঞ্জয় সৌরাষ্ট্রের পালিতানা সহরের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পশ্চিম রেলওয়ের দিল্লী-আহমেদাবাদ লাইনে মাহেসনা হতে সুরেন্দ্রনগরে যাবার গাড়ী পাওয়া যায়। এই সুরেন্দ্রনগর হতে যে লাইন গেছে ভাবনগর, তারি এক শাখা লাইন এসেছে সীহোর হতে পালিতানায়।

পালিতানায় অনেক জৈন মন্দির ও ধর্মশালা আছে। প্রায় প্রত্যেক ধর্মশালার সঙ্গেই মন্দির। তা ছাড়া পালিতানা এদিককার

একটী মুখ্য স্বাস্থ্যাবাস। সৌরাষ্ট্রের লোকেরা এখানে হাওয়া বদলাতে এসে থাকেন আমাদের এদিকের গিরিডি, মধুপুর, শিমূলতলার মতো।

শত্রুঞ্জয়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৯৭৭ ফুট এবং সমগ্র পর্বতটি দু'টী উচ্চশৃঙ্গে বিভক্ত। মাঝখানে অরণ্যাচ্ছাদিত অধিত্যকা। মন্দির নির্মাণের জন্য এই অধিত্যকার অধিকাংশই আজ অবশ্য ভরাট হয়ে গেছে। নীচে শত্রুঞ্জয় নদী। হিন্দুদের কাছে যেমন গঙ্গা, জৈনদের কাছে তেমনি এই শত্রুঞ্জয়, সমান পবিত্র।

পালিতানায় যেমন ধর্মশালা আছে, তেমনি ধর্মশালা আছে শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের নীচেও। এখানে এসেও তাই থাকা যায়। নীচ হতে পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি আছে—পাথরের ধাপ কাটা সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বিশ্রাম। কিন্তু তবুও তিন মাইল পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা একটু শক্ত বই কি। যাঁরা তা পারেন না, তাঁরা ডুলি করে ওপরে আসেন। ডুলি এখানে সব সময়েই পাওয়া যায়।

ওপরের চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে হনুমানের মন্দির। সেখান হতে পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একটী পথ গেছে ডান দিকের উত্তর শিখরে। অন্যটি অধিত্যকা হয়ে বাঁ দিকের দক্ষিণ শিখরে। যাত্রীরা সাধারণতঃ উত্তর শিখর হয়ে অধিত্যকা দিয়ে দক্ষিণ শিখরে যান।

শত্রুঞ্জয়ের মন্দিরগুলো দুর্গের মতো দৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টিত। মনে হয় সে মুসলমান আক্রমণের সময় হতে। তবু এই সমস্ত মন্দিরগুলোকে আক্রমণ ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা যায়নি। শত্রুঞ্জয়ে খৃষ্টীয় এগার শতক হতে মন্দির নির্মাণের কাজ সুরু হলেও তার অধিকাংশই আজ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই যে সমস্ত মন্দির

এখনো এখানে দেখা যায়, সেগুলো ষোল শতক বা তারো পরের। এত আক্রমণ ও ধ্বংসের পরেও যে শত্রুঞ্জয়ে এত মন্দির রয়েছে তার কারণ জৈন ভক্তদের ভক্তির প্রাবল্য। জীর্ণোদ্ধার ও মন্দির নির্মাণের কাজে সকলেই এখানে মুক্ত হস্তে অর্থ দান করেছেন। বস্তুতঃ মন্দির নির্মাণের কাজ এখানে কোনো সময়েই বন্ধ হয়ে থাকেনি। আজো প্রত্যেক জৈনের মনের বাসনা এখানে একটী মন্দির নির্মাণ করবার। তা যদি সম্ভব নাও হয় ত তীর্থঙ্করের চরণ প্রতিষ্ঠা।

শত্রুঞ্জয়ের সমস্ত মন্দিরের পরিচয় দেওয়া কারু পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাই সেই পরিচয় এক একটী মুখ্য মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমগ্র পাহাড়টিকে যে কয়টি টুঁকে ভাগ করা হয়েছে সেই টুঁকের নামে। যেমন খরতরবাসী টুঁক। চৌমুখ টুঁক। বিমলবসি টুঁক। মুখ্য মন্দিরের নামেই এই সব টুঁকের নাম। এই সব টুঁক আবার আকারে সকলে সমান নয়। কোন টুঁক খুব বড় ত কোনটি ছোট। টুঁকের মুখ্য মন্দিরের মধ্যেও আবার আদিনাথ, কুমার পাল, বিমল শা,' সম্প্রীতি রাজা ও চৌমুখ মন্দিরই সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। চৌমুখ মন্দিরে গর্ভগৃহের মাঝখানে উঁচু বেদীর ওপরে চারদিকে মুখ করা চারটি তীর্থঙ্করের মূর্তি বসান। চৌমুখ মন্দিরের বৈশিষ্ট্যই এই যে গর্ভগৃহের যে কোন দিকেই দাঁড়ান যাক না কেন সেখান হতেই তীর্থঙ্করের মূর্তির মুখোমুখি দর্শন হয়ে যাবে।

চৌমুখ মন্দির নিঃসন্দেহে এখানকার একটী প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের প্রধান গর্ভগৃহটি ২৩ ফুট চতুষ্কোণ। গর্ভগৃহের প্রধান দরজার সামনে একটী প্রমাণাকার সভাগৃহ। এই সভাগৃহেই যাত্রীরা পূজা ও জপাদি করে থাকেন। তবে এখানকার সব চাইতে পবিত্র মন্দির আদিশ্বরের। আদিশ্বরের মাতা মরু দেবী ও প্রধান গণধর পুণ্ডরীকের মন্দিরও এখানে আছে। চৌমুখ মন্দিরের

তুলনায় আদিশ্বরের মন্দিরের পরিকল্পনা সরল। তবে এর স্থাপত্য-রীতি অলঙ্কারধর্মী।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। কারণ শিল্পরীতির বিচারে আবুর মন্দিরের সঙ্গে শত্রুঞ্জয়ের কোনো একটী মন্দিরের কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু সমস্ত মন্দিরের সামূহিক সৌন্দর্যে ও পরিকল্পনার বিরাটত্বে বোধ হয় শত্রুঞ্জয়ের জুড়ি পাওয়াও ভার। দুধে ধোয়া স্বপ্নপুরীর কথা নিতান্ত অসার্থক নয়। কারণ এখানে শ্বেতপাথরেরই মেঝে, শ্বেতপাথরেরি থাম, শ্বেতপাথরেরি কক্ষ, শ্বেতপাথরেরি মূর্তি। কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করতে করতে তাই মনে হয় এসব যেন সত্য নয়, এ যেন সেই রূপকথার রোমান্স, নয়ত আমি দিবা-স্বপ্ন দেখছি। আর সেই অনুভূতি? যে দিকেই চাওয়া যাক না কেন সেই দিকেই চোখে পড়বে হাজার হাজার কক্ষে পদ্মাসনে বসা হাজার হাজার তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্তি। কি আয়ত, কি উজ্জ্বল তাঁদের চোখ। চোখ ত নয় যেন একটা দাহহীন দীপ্তি। সেই দীপ্তি এই দেহের আবরণ ভেদ করে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তখন অনাস্বাদিত এক ভাব মনের মধ্যে উদিত হবে। সেই এক অনুভূতির অপূর্বতা।
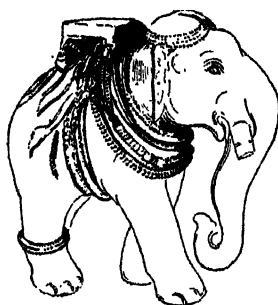
চার

গিরনার

সম্মেতশিখর যেমন কল্যাণ-তীর্থ, ঠিক তেমনি কল্যাণ-তীর্থ এই গিরনার। কুড়িজন তীর্থঙ্করের না হোক এমন একজন তীর্থঙ্করের এটি নির্বাণভূমি যাঁর চরিত্র, যাঁর তপস্যা সকলের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। কিন্তু গিরনার কেবল মাত্র অরিষ্টনেমির নির্বাণভূমিই নয়, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির ক্ষেত্রও। কারণ এই গিরনারেই কঠোর তপস্যা করে তিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

অরিষ্টনেমি জৈনদের যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাইশ সংখ্যক তীর্থঙ্কর। তেইশ পার্শ্ব ও সর্বশেষ মহাবীর। মহাবীরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনদিনই কোন প্রশ্ন ওঠেনি। পার্শ্বও আজ ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু অরিষ্টনেমির সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। তাঁর ঐতিহাসিকতা আজো সন্দিগ্ধ। তবে জৈন আগমে তাঁর নাম, গোত্র ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যে সব

তথ্য এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে তা হতে তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন সে ধারণাই দৃঢ় হয়।

অরিষ্টনেমি মথুরার নিকটবর্তী সৌরীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সমুদ্রবিজয়, মায়ের নাম শিবা। তিনি গৌতম গোত্রীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। বৃষ্ণি কুলোদ্ভব বলে বৃষ্ণিপুঙ্গব বলেও তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এঁর কাকাতো ভাই ছিলেন। অবশ্য বয়সে শ্রীকৃষ্ণই বড় ছিলেন।

জরাসন্ধের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাদবেরা যখন দ্বারকায় বসতি স্থাপন করেন তখন সমুদ্রবিজয়ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকায় এসে উপস্থিত হন। কুমার নেমি ছোটবেলা হতেই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তাই বিবাহেও তাঁর মন ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে এসে শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয্যে বিবাহে তাঁকে সম্মতি দিতে হয়। তাঁর সম্মতি পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্য ভোগরাজ উগ্রসেনের মেয়ে রাজীমতীকে প্রার্থনা করেন। কংসকে বধ করে এই উগ্রসেনকেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরার সিংহাসন দান করেছিলেন। মনে হয়, উগ্রসেনও যাদবদের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকায় চলে এসে থাকবেন। উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব সহর্ষে স্বীকার করে নিলেন। বললেন, কুমার নেমি তাঁর ঘরে এলে তিনি তাঁকে রাজীমতী দান করবেন।

তখন অরিষ্টনেমিকে সমস্ত রকম ওষধি দিয়ে স্নান করান হ'ল। স্নান ও তিলক রচনার পর দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মত্তগন্ধ হাতীতে আরূঢ় হলে তিনি তেমনি শোভা পেতে লাগলেন মুকুটমণি যেমন মুকুটে শোভা পায়। তাঁর মাথায় একজন বৃহৎ ছত্র ধারণ করেছিল এবং দু'জন চামর-ধারিণী তাঁকে দু'দিক হতে চামর ব্যজন করছিল। নেমি যাদব ও চতুরঙ্গিনী সৈন্য পরিবৃত হয়ে ঐরাবতে আরূঢ় দ্বিতীয় ইন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন। তারপর তূর্য

নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিবাহের শোভাযাত্রা প্রাসাদ হ'তে নির্গত হ'ল

অনেক পথ ঘুরে সেই শোভাযাত্রা যখন উগ্রসেনের প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে তখন কুমার নেমি বিবাহ মণ্ডপের অদূরে পিঞ্জরাবদ্ধ ভয়ার্ত ও দুঃখিত পশুদের দেখতে পেলেন। তিনি তাদের করুণ মুখচ্ছবি ও আর্তনাদে বিচলিত হয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারথি, এই সমস্ত স্বাধীন পশুদের এখানে কেন আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে? সারথি তার প্রত্যুত্তরে বলল, কুমার, সে আপনার বিবাহে উপস্থিত রাজন্যদের আহারের জন্য।

সে কথা শুনে অরিষ্টনেমি দুঃখিত হলেন। মনে মনে বিচার করে দেখলেন তাঁর জন্য যদি এতোগুলো প্রাণীর হত্যা হয় তবে তা উচিৎ হয় না। তিনি তখন সেই মত্তগন্ধ হাতী হতে অবতরণ করলেন ও সেই সমস্ত ভয়ার্ত পশুদের মুক্ত করবার আদেশ দিয়ে কুণ্ডল, কটিসূত্র ও আভরণাদি পরিত্যাগ করে সেইখান হতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ সংবাদ যখন প্রথম রাজীমতীর কাছে পৌঁছুল তখন তিনি শোকার্তা হয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। আকস্মিক এই আঘাত। কিন্তু মূর্চ্ছাভঙ্গের পর হৃদয়কে তিনি শক্ত করলেন। মনে মনে ভাবলেন, আমি কুমার নেমির দ্বারা পরিত্যক্তা হয়েছি। আমাতে যখন তাঁর মোহ নেই তখন তিনিই ধন্য। আমাকে ধিক্ যে তাঁর প্রতি আমার মোহ এখনো গেল না। তাই সংসারে থাকা আর আমার পক্ষেও উচিৎ হয় না। আমারও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

রাজীমতী তখন নিজের হাতে সেই নববধূর সাজ খুলে ফেললেন। মেঘ রজনীর মতো কালো চুল নিজের হাতেই উৎপাটিত করলেন। তারপর তিনিও প্রব্রজ্যা নিয়ে সংসার পরিত্যাগ

করে গেলেন। মা কত চোখের জল ফেললেন, পিতা কত প্রবোধ দিলেন, সখীরা কত অনুনয় করল, কিন্তু তিনি কারুর কথা কানে নিলেন না।

বোধ হয় এই জন্যই কুমার নেমির অভিনিষ্ক্রমণ বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। বিবাহ-বাসর হতে শ্রমণ দীক্ষা। এমন অভিনিষ্ক্রমণ জৈন সাহিত্যে কেন বিশ্বের সাহিত্যেও বিরল। তাই এই অভি-নিষ্ক্রমণ কত কবি কত ছান্দসিককে গীত ও গাথা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই সমস্ত গীত ও গাথা পড়তে পড়তে আজো আমা-দের বুক বেদনায় টনটন করে ওঠে, চোখ ছাপিয়ে জল ভরে আসে। কি গভীর সেই মানবীয় আর্তি।

মূহূর্তেরো সময় লাগল না
মাতাপিতা পরিবারবর্গকে ছেড়ে যেতে।
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেল সে
উঠল গিয়ে গিরনারে
প্রিয় মা পেছনে অঝোরে চোখের জল ফেললেন।

গিরনার বর্তমান জুনাগড় শহর হতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। পশ্চিম রেলওয়ের যে সুরেন্দ্রনগরের কথা আগেই বলা হয়েছে, সেই সুরেন্দ্রনগর হতে দ্বারকা-ওখা লাইনে রাজ-কোট একটি প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। রাজকোট হতে ৬৩ মাইল দূরে বেরাবলের দিকে এই জুনাগড়। বেরাবল হতেও জুনাগড়ে আবার আসা যায়।

জুনাগড় অর্থ পুরাণো দুর্গ। বাস্তবেও এখানে একটী পুরাণো দুর্গ রয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক দিনের অনেক স্মৃতি এখানে টুকরো টুকরো হয়ে আজো ছড়িয়ে আছে। জুনাগড়কে তাই একদিনেই দেখে শেষ করা যায় না। এখানে আসতে হলে অন্ততঃ দু'দিনের সময় হাতে নিয়েই আসতে হয়।

জুনাগড় হতে গিরনার যাবার পথে উপরকোট সেই প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গটি ১৩৫০ হতে ১৫৯২ পর্যন্ত বারবার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি। দুর্গের তোরণটি হিন্দু স্থাপত্য রীতির একটী প্রাচীন নমুনা ও সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য। দুর্গের মধ্যে বৌদ্ধ মূর্তি সম্বলিত অনেকগুলো গুহা আছে। তাই মনে হয় এককালে এই দুর্গটি বৌদ্ধবিহার ছিল এবং এখানে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন।

উপরকোট হতে গিরনারের দিকে আরো এগিয়ে গেলে বাগেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির। এই বাগেশ্বরী মন্দিরের সামান্য আগে একটী বৃহৎ পাথরে অশোকের চতুর্দশ শিলালেখটি উৎকীর্ণ। ওই পাথরের গায়েই আবার রুদ্রদমন (১৫০ খৃষ্টাব্দ) ও স্কন্দগুপ্তর (৪৫৪ খৃষ্টাব্দ) শিলালেখ বর্তমান। এই শলালেখ ছাড়িয়ে গিরনারের প্রায় কাছাকাছি এলে স্বর্ণরেখা নামে একটী ছোট নদী। এই নদীর জলকেই আবদ্ধ করে দামোদর কুণ্ড তৈরী করা হয়েছে। এই দামোদর কুণ্ডের জলে অস্থি বিসর্জন করা হয়। এখানকার জলের এমনি গুণ যে সেই জলের স্পর্শে অস্থিও গলে' জলে পরিণত হয়। কুণ্ডের পাশেই রাধা-দামোদরের মন্দির। মন্দিরের পরে রেবতীকুণ্ড ও লম্বা হনুমান। এই লম্বা হনুমান হতেই প্রকৃতপক্ষে গিরনারের চড়াই। এখানে জৈন মন্দির ও ধর্মশালা আছে।

গিরনারের চড়াই কম করেও দু'হাজার ফুটের ওপর। যাঁরা ১০,০০০ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠতে না পারেন তাঁরা ডুলি করতে পারেন। শত্রুঞ্জয়ের মতো এখানেও ডুলি পাওয়া যায়।

নীচের অধিত্যকা হতে মাইল দুই ওপরে জৈনদের বিখ্যাত মন্দিরগুলো। বৃহৎ মন্দিরটি অরিষ্টনেমির। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। ১৯৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৩০ ফুট প্রস্থ প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত ১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রস্থ মন্দিরটি

স্তম্ভযুক্ত সত্তরটি কক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত। গর্ভগৃহের সম্মুখের মণ্ডপটি চতুষ্কোণ, বাইশটি অনবদ্য থামের ওপর মণ্ডপের বিমানাকার ছাদ, গর্ভগৃহে প্রমাণাকার অরিষ্টনেমির কালো পাথরের মূর্তি। এই মন্দিরেই পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি আছে যাঁর চিবুক হতে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে।

অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বস্তুপাল-তেজপালের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুপাল-তেজপালের কথা আগেই বলা হয়েছে। আবু, শত্রুঞ্জয় ও গিরনারের মন্দির নির্মাণ করে তাঁরা প্রখ্যাত হয়ে আছেন। মন্দিরটি মল্লিনাথের এবং বস্তুপালের স্ত্রী ললিতাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত।

মুখ্য পথ হতে খানিকটা নেমে গিয়ে রাজীমতী বা রাজুলের গুহা। গুহায় রাজীমতীর মূর্তি আছে ও নেমির চরণ চিহ্ন। প্রবেশ পথ এত সঙ্কীর্ণ যে না বসে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না।

অম্বামাতার মন্দির এখানকার আর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। সাতপুড়া হয়ে অম্বিকা শিখরে উঠে এলে তবে এই মন্দিরে আসা যায়। সাতপুড়ায় সাতটি শিলার তল দিয়ে জল প্রবাহিত হয়। তাই এই নাম। অন্য নাম গোমুখী।

অম্বামাতার মন্দিরে নববিবাহিত দম্পতিরা এসে থাকেন। বলা হয়, পার্বতী হিমালয় হতে এখানে এসে কিছুকাল বাস করেন। অনেকে একে একান্নটি শক্তিপীঠের একটী প্রধান শক্তিপীঠ বলেও অভিহিত করে থাকেন। দেবীর উদর ভাগ নাকি এখানে পতিত হয়েছিল। জৈনদের কাছেও এই মন্দির আবার পবিত্র। কারণ অম্বিকা অরিষ্টনেমিরও শাসন-দেবী ছিলেন।

অম্বিকা শিখরের একটু ওপরে গোরক্ষ শিখর। নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এখানে তপস্যা করেছিলেন। এখনো এখানে

তাঁর ধুনী বর্তমান। এখানে একটি শিলার তল দিয়ে শুয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। এই শিলাকে যোগী শিলা বলা হয়।

গোরক্ষ শিখর হতে ৬৭০টি সিঁড়ি নেমে ৮০০টি সিঁড়ি উঠলে দত্ত শিখর। দত্ত শিখর গুরু দত্তাত্রেয়ের তপঃস্থান। গুপ্তভাবে হলেও এখানে তাঁর নিত্য-সান্নিধ্য। জৈনদের কাছেও দত্ত শিখর আবার পবিত্র। কারণ এইখানেই নেমি নির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে বলা হয়। ভিন্ন মতে তাঁর নির্বাণ-স্থান অরিষ্টনেমি শিখর। গোরক্ষ শিখর হতে নেমে দত্ত শিখরে উঠবার আগে অরিষ্টনেমি শিখরে উঠতে হয়। এখানে অরিষ্টনেমির কালো পাথরের একটী মূর্তি আছে।

জৈন যাত্রীরা সাধারণতঃ এইখান হতেই প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর গোরক্ষ শিখর, সাতপুড়া হয়ে সহস্রাম্রবনের দিকে নেমে যান।

গিরনারের পবিত্রতার কথা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না। কারণ, গিরনার সিদ্ধ, যোগী, শ্রমণ, সকলেরি তপস্যার ক্ষেত্র। গিরনার তাই কেবলমাত্র সামান্য তীর্থক্ষেত্রই নয়, তপোভূমি। সেই তপঃপ্রভাবকে গিরনারে এলে আজো অনুভব করা যায়।

পাঁচ

শ্রবণ বেলগোল

যে তিনটি জায়গা মহীশূর রাজ্যকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে শ্রবণ বেলগোল তার একটী। বেলুর ও হালেবিদ-এর কথা হয়ত অনেকেরই জানা আছে। তাদের খ্যাতি মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য। মন্দিরের গায়ে সূক্ষ্ম অলঙ্করণ। কিন্তু সব কিছুকে সেখানে হার মানিয়ে গেছে শিল্পীর ধৈর্য। দিনের পর দিন কি নিষ্ঠার সঙ্গেই না তাদের পাথর কুরে মূর্তি বার করতে হয়েছে ও লতা পাতা। কিন্তু শ্রবণ বেলগোলের খ্যাতি ঠিক সে কারণে নয়, অন্য কারণে। সেখানে সেই অলঙ্করণ নেই, কিন্তু আছে শিল্পীর রূপ-কল্পনার দুঃসাহস আর নির্মাণ-শৈলীর সৌকর্য। সেই এক বিস্ময়ের চমক। গোম্মটেশ্বর একটী পাথরে তৈরী পৃথিবীর সব চাইতে বড় মূর্তি। ৫৭ ফুট দীর্ঘ। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা শিল্প-সৌন্দর্যেও তা অতুলনীয়।

গোম্মটেশ্বর নামে পরিচিত হলেও মূর্তিটি বাহুবলীর। বাহুবলী দক্ষিণ ভারতে কি করে গোম্মটেশ্বর নামে পরিচিত হলেন তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবতঃ এই মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাতা চামুণ্ড রায়ের গোম্মট নাম হতে এই নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে। তবে বাহুবলী উত্তর ভারতে কোনো সময়েই গোম্মটেশ্বর নামে পরিচিত হন নি।

আগেই বলা হয়েছে বাহুবলী প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভ-দেবের পুত্র ছিলেন। ঋষভদেব যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তখন তাঁর সমগ্র রাজ্য পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত করে দেন। ভরত অগ্রজত্বের অধিকারে অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। বাহুবলী তক্ষশীলার রাজ্য প্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম ভরত ও বাহুবলীতে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু ভরত যখন রাজ-চক্রবর্তীত্বের জন্য সমগ্র পৃথিবী জয় করে এলেন ও বাহুবলীকে আনুগত্য জানাবার আদেশ দিয়ে তক্ষশীলায় দূত প্রেরণ করলেন তখন সে সম্প্রীতি নষ্ট হবার উপক্রম হল। ভরতের দূত অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে ভরত সৈন্যসহ তক্ষশীলায় এসে উপস্থিত হলেন। বহুদিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণীত হল না। ভরত অকারণ সৈন্যক্ষয় বন্ধ করবার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠালেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হবেন তাঁর জয় হবে। বাহুবলী সে প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন।

তারপর যে কয়েক রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবার কথা ছিল তার সব ক'টিতেই বাহুবলীর জয় হল, ভরতের হার। শেষ যুদ্ধ মুষ্টিযুদ্ধ। বাহুবলী ভরতের মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করে উঠে এলেন। এবারে বাহুবলীর মুষ্ট্যাঘাত করবার কথা। কিন্তু ভরত জানেন সে মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। ভরত তাই ভয়ে চক্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু চক্র ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ভরতের অন্যায়াচরণে আরো

ক্ষুব্ধ হয়ে বাহুবলী যখন ভরতকে আঘাত করবার জন্য মুষ্টি তুলেছেন তখন না জানি কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। বাহুবলীর মনে জাগতিক সুখ সম্পর্কে একটা ধিক্কার এলো। ভাবলেন, ধিক্! সামান্য রাজ্যসুখের জন্য কিনা তিনি তাঁর অগ্রজকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। বাহুবলী সেই মুহূর্তেই রাজ্য ধন সম্পদ সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

এর পর বাহুবলী কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। ধ্যানে তিনি এমনি তন্ময় হয়ে গেলেন যে তাঁর গা বেয়ে লতা উঠল, পায়ের কাছে উঁইয়ে বাসা বাঁধল। কিন্তু এই কঠোর তপস্যা সত্ত্বেও বাহুবলীর কেবল-জ্ঞান লাভ হল না।

ভগবান ঋষভদেবের মেয়ে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী, যাঁরা অনেকদিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা একদিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাহুবলী কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন কিনা?

সে কথা শুনে ঋষভদেব একটু হাসলেন। বললেন, না। হাতীর ওপর চড়ে থাকলে কেবল-জ্ঞান লাভ করা যায় না।

হাতীর ওপর চড়ে থাকা আর কিছু নয়, অভিমান। কিসের অভিমান? শ্রমণ ধর্মানুযায়ী পূর্ব-দীক্ষিত ছোট ভাইদের বন্দনা করতে হবে বলে বাহুবলী যে এখনো ঋষভদেবের কাছে আসতে পারেন নি সেই অভিমান।

ব্রাহ্মী ও সুন্দরী তখন বাহুবলীর কাছে গেলেন যেখানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁরা সেখানে গিয়ে গান করে তাঁকে সেই কথা জানিয়ে দিলেন—দিনের আলোয় গান করলেন, তারা ছিঁটিয়ে দেওয়া রাতের অন্ধকারে গান করলেন। সেই গানের সুরে বাহুবলীর ধ্যান-স্তিমিত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে এল। তিনি গানের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। তারপর যেই নিরভিমান হয়ে ঋষভদেবের কাছে যাবার জন্য পা তুলছেন,

ওমনি তাঁর প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়ে গেল। তিনি কেবলী হলেন।

প্রবাদ, তাঁর দেহাবসানের পর মহারাজ ভরত বাহুবলীর ৫২৫ ধনু পরিমিত এক স্ফটিক শিলার প্রতিমূর্তি তক্ষশীলার কাছে পোতনপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালে সেই মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সম্ভবতঃ অরণ্যই তাকে গ্রাস করে। তারপর তা কুক্কুট সর্পের নিলয়ে পরিণত হয়।

আচার্য জীনসেনের মুখে এই প্রবাদের কথা জানতে পেরে চামুণ্ড রায়ের মা প্রতিজ্ঞা করেন সেই স্ফটিক মূর্তির তিনি যতদিন না দর্শন করবেন ততদিন আর দুধ গ্রহণ করবেন না। চামুণ্ড রায় গঙ্গারাজাদের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি মা'র এই প্রতিজ্ঞার কথা অবগত হয়ে মাকে নিয়ে পোতনপুরে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু সেই মূর্তি দর্শন করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয় না। চামুণ্ড রায় তখন ঐ ধরণের একটী মূর্তি আবার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করতে সুরু করেন। সেই চিন্তার ফল শ্রবণ বেলগোলের এই গোম্মটেশ্বর মূর্তি। মূর্তিটি পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত বলে পনের মাইল দূর হতেও সুস্পষ্ট দেখা যায়।

শ্রবণ বেলগোল মহীশূর রাজ্যের হাসান জেলায় অবস্থিত। বাঙ্গালোর হতে এর দূরত্ব ১০২ মাইল। বাঙ্গালোর, আরসীকেরে বা হাসান যে কোন জায়গা হতেই এখানে আসা যায়। হাসান হতে এর দূরত্ব মাত্র ৩১ মাইল। সব ক'টি জায়গা হতেই এখানে বাস আসে। বাঙ্গালোর কি মহীশূর এলে যেমন বেলুর, হালেবিদ যাবার, তেমনি এই শ্রবণ বেলগোলও। দু'টী পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত বলে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আবার ভারী মনোরম।

শ্রবণ বেলগোলের উত্তরে চন্দ্রগিরি গাছপালায় সবুজ। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি বা ইন্দ্রবেত্তায় সবুজের স্পর্শ নেই। এই বিন্ধ্যগিরির

শিখরে পাথর কেটে মূর্তি বার করা হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি অসাধ্য সাধনই না করেছিল সে দিনের সেই সব শিল্পীরা।

এই দু'টী পাহাড়ের মাঝখানে একটী ছোট্ট সরোবর। বেলগোল বা শ্বেত সরোবর। সম্ভবতঃ এই সরোবরের নামেই গ্রামের নাম। তার সঙ্গে শ্রমণ শব্দটি কালে যুক্ত হয়েছিল এক সময় এখানে অনেক জৈন শ্রমণ একসঙ্গে থাকতেন বলে। শ্রমণের অপভ্রংশই শ্রবণ। সে যা হোক, সরোবরটি সত্যিই মনোরম।

বিন্ধ্যগিরির শিখরে উঠবার পাথর-কাটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির মুখেই একটী মন্দির যার দ্বিতলে ভগবান পার্শ্বনাথের মূর্তি। তারপর পাহাড়ের মাথায় উঠে এলে একটী প্রাচীন প্রাকার দেখা যাবে। এই প্রাকারের মধ্যেই প্রথমে চব্বিশ তীর্থঙ্করের বসতি। মন্দিরটি ছোট। এই মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে একটী কুণ্ড। কুণ্ডের কাছেই চেন্নণ বা চন্দ্রপ্রভুর বসতি। এই চেন্নণ বসতির একটু আগে উঁচু চবুতরার ওপর আদিনাথ, শান্তিনাথ ও আরিষ্টনেমির একটী মন্দির। এই মন্দিরটি বিন্ধ্যগিরির অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে নিঃসন্দেহে বড়।

এই মন্দিরের আরো আগে ভেতরের প্রাকারের মধ্যে দিয়ে ওপরে উঠে যাবার একটা দরজা। দরজার কাছে ভরত ও বাহুবলীর মন্দির। এখানে আরো কিছু মূর্তি রয়েছে। তারপর আর একটা প্রাকারের ভেতর প্রবেশ করলে বাহুবলীর সেই মূর্তিটির কাছে এসে পড়া যায়। মূর্তিটি সুডৌল।

বারো বছর পরপর যখন মূর্তিটির অভিষেক-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অগণিত জৈন তীর্থযাত্রী এখানে এসে থাকেন। অভিষেকে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটিকে দুধ দই মধু ঘী ফল গিনি ও রূপোর টাকা

দিয়ে স্নান করান হয়। এর জন্য মূর্তিটির সমান উঁচু একটী মঞ্চও তৈরী করা হয়। সেই মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে পুরোহিত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই দৃশ্যও দেখবার মতো। সেই সময় এখানে এলে সেই মহোৎসবের আনন্দে অংশ গ্রহণও করা যায়।

বিন্ধ্যগিরির সম্মুখেই চন্দ্রগিরি। তবে উচ্চতায় বিন্ধ্যগিরির তুলনায় চন্দ্রগিরি অনেক ছোট এবং ওপরে উঠবার শেষ পর্যন্ত সিঁড়িও নেই। সামান্য মাত্র পথ রয়েছে। চন্দ্রগিরির মাথায় একটী প্রাকারের মধ্যে অনেক জৈন মন্দির ও শিলালেখ আছে। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে চামুণ্ড রায় বসতি, চন্দ্রগুপ্ত বসতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ে উঠবার মুখে একটী গুহা আছে—যাকে ভদ্রবাহুর গুহা বলে অভিহিত করা হয়। ভদ্রবাহু এখানেই নির্বাণ লাভ করেন। গুহায় তাঁর চরণ-চিহ্ন বর্তমান।

এই ভদ্রবাহুকেই অনেকে পঞ্চম শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহু বলে মনে করেন যিনি কল্পসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ভদ্রবাহুকেই আবার মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু বলে অভিহিত করা হয়। পাটলীপুত্রে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হলে এঁকে অনুসরণ করেই চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যে আসেন ও জীবনের শেষ বারো বছর এখানে অতিবাহিত করে অনশনে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার অবসর আছে। কারণ পঞ্চম শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহুর সময় চন্দ্রগুপ্তেরও প্রায় ৮০ বছর আগে। তাই ভদ্রবাহুর পক্ষে চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে দুর্ভিক্ষের কথা এখানে বলা হয়েছে তা নন্দরাজাদের সময়েই পাটলীপুত্রে হয়েছিল ও ভদ্রবাহু স্বামী পাটলীপুত্র হতে তখন নেপালের দিকে প্রস্থান করেন, দাক্ষিণাত্যে নয়। তাছাড়া যে ভদ্রবাহু স্বামী দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তিনি দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই উজ্জয়িনী হতে সাধুসঙ্ঘ সহ দাক্ষিণাত্যে গমন করেন বলে বলা হয়ে

থাকে। তাই মনে হয়, এই ভদ্রবাহু পঞ্চম শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহু নন্ ও এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্। চন্দ্রগিরির শিলা-লেখগুলি হতেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হতে দেখা যায়

কিন্তু এ সব তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিকেরাই বিচার করুন। আমরা বাহুবলীর সেই মূর্তির কথাতেই আবার ফিরে যাই। আজ এক হাজার বছরেরও উপর মূর্তিটি অনাবৃত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত ঝড় জল রোদ এর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অথচ এর সেই সৌকর্য, সেই সৌন্দর্য—তা একটুও ম্লান হয় নি। যে হাসি শিল্পী মূর্তিটির মুখে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই হাসি আজো তেমনি অ-মলিন। তাই একে পাথরের মূর্তি বলে আর মনে হয় না। মনে হয় সেই বাহুবলীই আজো যেন কায়োৎসর্গ ধ্যানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাল এঁর পায়ের কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে, জরা হয়েছে সম্পূর্ণ পরাভূত। এই মূর্তির যে সৌন্দর্য তাই মনে হয় সে সেই ধ্যান-সমাহিতিরই সৌন্দর্য।

ছয়
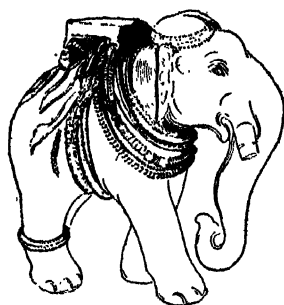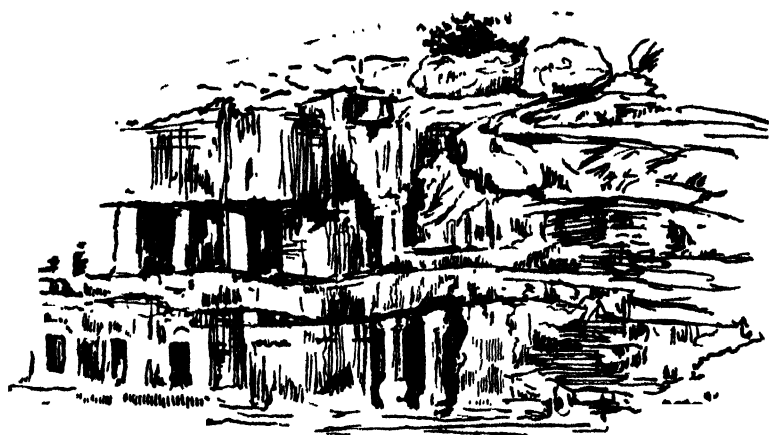
উঁদয়গিরি-খণ্ডগিরি

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলোর প্রাচীনত্ব ও শিল্প-সৌকর্যের কথা জানা থাকলেও এগুলো যে দু'হাজার বছরের ওপর হতে জৈন তীর্থ সে কথা হয়ত অনেকেরি জানা নেই। উদয়গিরি-খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলো খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকের এবং প্রধানতঃ জৈন শ্রমণদের বাসোপযোগী করে নির্মিত। তাই এতো প্রাচীন গুম্ফা ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর অন্যখানেও বিরল। এই জন্যই পৃথিবীর দূর দূরান্ত হতে যাত্রীরা এখানে এসে থাকেন এই গুম্ফাগুলো দেখবার জন্য। উদয়গিরি-খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলো তাই জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণিত হতে পারে।

উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্র বা বিরজামণ্ডল কোনো পরিচয়েরই অপেক্ষা রাখে না। এই বিরজামণ্ডলের ঠিক মাঝখানে উদয়গিরি ও খণ্ড-গিরি। এই উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিকে ঘিরেই শঙ্খমণ্ডলে সমুদ্রতীরে

জগন্নাথ, চক্রমণ্ডলে একাম্র বনে লিঙ্গরাজ, গদামণ্ডলে বৈতরণী তীরে যাজপুর—প্রধান শক্তি-পীঠ ও পদ্মমণ্ডলে চন্দ্রভাগা তীরে কোণারক—অর্কক্ষেত্র। তাই উদয়গিরি-খণ্ডগিরির পবিত্রতার সীমা নেই।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির সঙ্গে জৈন শাসনের সম্পর্ক অনেক কালের। খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকের কথা নয় তারো অনেক আগে মহাবীরের সময়েই কলিঙ্গাধীশ জীতারি এই উদয়গিরিতেই কঠোর তপস্যা করে অর্হতত্ব লাভ করেন। তিনি মহাবীরের পিতৃ-স্বসাকে বিবাহ করেছিলেন ও সেই সূত্রে মহাবীরের প্রভাবে এসে জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। উদয়গিরির তখনকার নাম ছিল কুমারী-গিরি। কুমারীগিরিতে ভগবান মহাবীরেরও পদপাত হয়েছিল। কলিঙ্গদেশস্থ ৫০০ জন সাধু এই উদয়গিরিতেই তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

তবে ঐতিহাসিক ভাবে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির যে গৌরবের ইতিহাস তা খৃঃ পূঃ ২য় ও ১ম শতকের। চেতবংশের খারবেল সেই সময় কলিঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল উদয়গিরির নিকটবর্তী শিশুপালগড়। তিনি যেমন পরাক্রম-শালী ছিলেন তেমনি পরম ধার্মিক। জৈন ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। হস্তী গুম্ফার শিলালেখ হতে জানা যায় যে তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে তিনি মগধের শাসনকর্তা ভাস-তিমিতকে পরাজিত করে নন্দ রাজারা কলিঙ্গ হতে যে জিন মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন সে'টি পুনরুদ্ধার করে পুনরায় কলিঙ্গে ফিরিয়ে আনেন। এই শিলালেখটি তাঁর রাজত্বের চতুর্দশ বছরে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই শিলালেখ হতে আরো তাঁর রাজত্বের তের বছরের ঘটনা বিশেষভাবে জানা যায়। পনের বছর বয়সে খারবেল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন ও তার নয় বছর পরে কলিঙ্গের সিংহাসনে

আরোহণ করেন। যৌবরাজ্যে থাকা কালীনই তিনি লিখন-বিদ্যায়, গণিতে, স্মৃতিশাস্ত্রে ও অর্থ-বিদ্যায় প্রৌঢ়ত্ব লাভ করেন। রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে তাঁর সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণানদী অতিক্রম করে। চতুর্থ বছরে রাঠিক ও ভোজকদের তিনি পরাস্ত করেন। অষ্টম বছরে গোরথগিরির যুদ্ধে মগধবাহিনী তাঁর হস্তে পরাজিত হয়। দশম ও একাদশ বছরেও তিনি মগধের ওপর আক্রমণ চালান ও প্রভূত বিত্ত আহরণ করেন। ত্রয়োদশ বছরে তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাস্ত করেন। ঐ বছরই তিনি উদয়গিরিতে জৈন শ্রমণদের বাসের জন্য গুম্ফা ও গুম্ফা-মন্দির নির্মাণ করান। ত্রয়োদশ বছর হতেই জিন-সম্রাট রাজ-চক্রবর্তী খারবেল ধর্ম কর্মে বিশেষভাবে মন দেন ও জৈন আগমাদি অধ্যয়ন করতে সুরু করেন। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ সংহিতির মতো জৈন সাধুসঙ্ঘকে একত্রিত করে তিনি 'অঙ্গসতিকং তুরিয়ং' অর্থাৎ একাদশ অঙ্গ সঙ্কলিত করান। খারবেল-মহিষীও আবার নির্গ্রন্থ ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাঁর নিবাসের জন্য খারবেল উদয়গিরিতে একটী অট্টালিকাও নির্মাণ করান। খারবেল তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরের পরেও যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তা স্বর্গপুরীর শিলালেখ হতেই জানা যায়। এই শিলালেখটি খারবেল-পত্নী অগ্রমহিষী কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ভুবনেশ্বর হতে ৭ মাইল দূরে একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। এই গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে কটক রোডটি বিস্তৃত। তাই ভুবনেশ্বর হতে গাড়ীতে বা ষ্টেশন-ওয়াগনে সহজেই এখানে আসা যায়। তবে এ কথা না বলে উপায় নেই যে গুম্ফাগুলো খুব সুরক্ষিত নয় এবং ভালো পথ না থাকায় পাহাড়ে ওঠাও কষ্টকর।

উদয়গিরির গুম্ফাগুলো কোনো একটী বিশেষ জায়গায়

অবস্থিত নয়, পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। প্রথমেই স্বর্গপুরী গুম্ফা। স্বর্গপুরী হতে ডানদিকে যে পথ গেছে তা রাণী গুম্ফা ও গণেশ গুম্ফা হয়ে ওপর দিয়ে পেছনের হাতী গুম্ফায় এসে শেষ হয়েছে। স্বর্গপুরী হতে বাঁ দিক দিয়ে যে পথটি জয়-বিজয় ও বৈকুণ্ঠ গুম্ফা হয়ে হাতী গুম্ফায় এসেছে তা এখানে পূর্বোক্ত পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অবশ্য আজ আর এই পথ-রেখা সবখানে সুস্পষ্ট নয়—অনেক ক্ষেত্রেই অরণ্যাচ্ছাদিত ও ভগ্ন।

স্বর্গপুরী খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকের ও দু'টী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রকোষ্ঠ দু'টী শ্রমণদের শয়নোপযোগী করে নির্মিত। খারবেল-পত্নী এই গুম্ফাটি নির্মাণ করান। স্বর্গপুরীতে উদ্গত থামের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি যে চারটি তোরণ রয়েছে তা খুবই সুন্দর। প্রত্যেক তোরণের গায়ে দু'টী করে হাতী।

উদয়গিরির গুম্ফাগুলোর মধ্যে রাণী গুম্ফাই সব চাইতে বড় ও সুন্দর। রাণীর বাসের জন্য এই গুম্ফা-মন্দিরটি বিহার ও চৈত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে নির্মিত। দ্বিতল এই গুম্ফাটির ওপরে এবং নীচে আটটি করে প্রবেশ-পথ। ওপরে বহু-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ। প্রাচীরের গায়ে কত লতা-পাতা কত কাহিনী পাথরে উৎকীর্ণ। উত্তর দিকের একটী কক্ষের ভেতরে অনেক মূর্তি। একটী প্রকোষ্ঠে সাড়ে চার ফুট প্রমাণাকার সৈনিক, হাতে বল্লম। বোধ হয় দ্বারপাল।

গণেশ গুম্ফা খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকের এবং উদয়গিরির সব চাইতে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। গুম্ফাটি দু'টী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সামনের দিকে একটী আচ্ছাদিত অলিন্দ। গণেশ গুম্ফার থাম-গুলো চতুষ্কোণ। থামের পায়ের কাছে ও শীর্ষদেশে স্তম্ভদণ্ড। থামের শীর্ষদেশের বন্ধনী অলিন্দের ছাদকে স্পর্শ করে আছে। গণেশ গুম্ফার প্রাচীরের গায়েও পাথরে অনেক কাহিনী উৎকীর্ণ।

এক হিসেবে রাণী গুম্ফার এটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এখানে একটী কক্ষে প্রাচীরের গায়ে গণেশের একটা প্রমাণাকার মূর্তি রয়েছে। এই গণেশ মূর্তির জন্যই গুম্ফাটির নাম গণেশ গুম্ফা।

জয়-বিজয় দ্বিতল গুম্ফা। খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকে নির্মিত। প্রতি তলায় দুটো করে চারটি চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ ও একটী করে অলিন্দ। অলিন্দের তিন দিকে অনুচ্চ দীর্ঘ আসন। দ্বিতলের অলিন্দের দুই দিকে দ্বারপালরূপে একজন পুরুষ ও একজন নারী। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পথ অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের আকারে রচিত।

বৈকুণ্ঠ গুম্ফাও দ্বিতল গুম্ফা। রাণী গুম্ফা ও গণেশ গুম্ফার মতোই এখানকার ভেতরের অলঙ্করণ।

হাতী গুম্ফা অগভীর প্রাকৃতিক গুম্ফা। এই গুম্ফাটি খারবেলের শিলালেখটির জন্য বিখ্যাত।

এ ক'টি প্রধান গুম্ফা ছাড়াও এখানে আরো অনেক গুম্ফা আছে। তাদের মধ্যে অলকাপুরী, মঞ্চপুরী, পরনারী, সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি গুম্ফার নাম উল্লেখযোগ্য। সর্প গুম্ফার প্রবেশ পথের ওপরে সর্পমূর্তি উৎকীর্ণ। গুম্ফাটি এতো সংকীর্ণ যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। ব্যাঘ্র গুম্ফাটি বাঘের ব্যাকৃত মুখের অনুরূপ।

উদয়গিরির গায়েই পথের ওপর দিকে খণ্ডগিরি। এই খণ্ডগিরির শিখরে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি পরবর্তী কালের। কটকের রাজা মুঞ্জ চৌধুরী এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরের পাশে আকাশ-গঙ্গা নামে একটী জলের কুণ্ড আছে।

খণ্ডগিরির খাড়াই পথে ৫০ ফিট মতো ওপরে এসে ডান দিকে যে পথ গেছে সেই পথের ওপরই অনন্ত গুম্ফা। গুম্ফাটি খৃঃ পূঃ

১ম শতকের। এর তোরণ সর্পের ফণার ওপর অবস্থিত বলে গুম্ফাটির নাম অনন্ত গুম্ফা। গুম্ফাটিতে একটী মাত্র প্রকোষ্ঠ ও সম আয়তনের একটী আচ্ছাদিত অলিন্দ। প্রকোষ্ঠে যাবার চারটি প্রবেশ-পথ। ভেতরে প্রাচীরের গায়ে নানা চিত্র উৎকীর্ণ।

অনন্ত গুম্ফা হতে খানিকটা নেমে এসে তেন্তুলি গুম্ফা। তেন্তুলি গুম্ফার সম্মুখের তেঁতুল গাছ হতে গুম্ফাটির ওই নাম।

তত্ত্ব গুম্ফা খৃঃ পূঃ ১ম শতকের। ভেতরের সভাগৃহে প্রবেশের এখানে তিনটি প্রবেশ-পথ। গুম্ফাটি সত্যি অনবদ্য। এই তত্ত্ব গুম্ফা ছাড়াও এখানে আরও একটী তত্ত্ব গুম্ফা আছে।

এছাড়া এখানে ধ্যানঘর, নবমুনি, বড়ভুজ, ত্রিশূল, ললাটেন্দু, কেশরী ইত্যাদি আরো কয়েকটি গুম্ফা রয়েছে। ধ্যানঘরে একটী মাত্র সভাগৃহ। নবমুনিতে লাঞ্ছন সহ জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। বড়ভুজেও তীর্থঙ্করদের মূর্তি রয়েছে। ত্রিশূল গুম্ফায় চব্বিশজন তীর্থঙ্কর প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ। ললাটেন্দু দ্বিতল গুহামন্দির। তবে সম্মুখভাগ ধ্বস্ নামায় ভগ্ন। প্রাচীরের গায়ে তীর্থঙ্কদের মূর্তি। খোদিত। এই ললাটেন্দুর সামনে একটা বৃহৎ পাথরের ওপর তিনটি জৈন মূর্তি রয়েছে।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলো যদিও কোন সুপরিকল্পিত রীতিতে রচিত হয় নি তবুও নির্মাণ-কৌশলের জন্য এরা প্রশংসার দাবী রাখে। অগভীর প্রাকৃতিক গুম্ফাগুলোকে যে ভাবে সেদিন শ্রমণদের আবাসে পরিণত করা হয়েছে তা সত্যি প্রশংসার। শুধু তাই নয়, গুম্ফাগুলোর প্রাচীরের গায়ে যে সব চিত্রাদি পাথরে উৎকীর্ণ হয়েছে বা যে সমস্ত মূর্তি পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তাদের শিল্পমূল্যও কিছু কম নয়। প্রাকৃতিক, জৈব ও মানবীয় চিত্রগুলি তাদের স্বাভাবিকত্বে আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি যদিও আজ জনবসতিহীন অরণ্যে

পরিণত হয়েছে তবু একদিন এখানে মানুষের কলকণ্ঠে গিরিকন্দর-গুলো সর্বদাই মুখরিত ছিল। এখানে কত ধর্মদেশনা হয়েছে কত শাস্ত্রীয় বিচার। মনকে একটু সংযত করে নিয়ে বসলে আজও হয়ত এখানে শোনা যাবে সেদিনের শ্রমণ কণ্ঠোচ্চারিত

নমো অরিহন্তাণং
নমো সিদ্ধাণং
নমো আয়রিয়াণং
নমো উবজ্ঝায়াণং
নমো লোএ সব্বসাহূণং *

পঞ্চ নমোক্কার মন্ত্র। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি তাই জৈনমাত্রের পরম শ্লাঘার।

*অর্হৎকে নমস্কার করি। সিদ্ধকে নমস্কার করি। আচার্যকে নমস্কার করি। উপাধ্যায়কে নমস্কার করি। সংসারের সমস্ত সাধুদের নমস্কার করি। এই নমস্কার সাধারণ নমস্কার নয়। 'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে'—রবীন্দ্রনাথ নমস্কার এখানে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই নমস্কার। এর তাৎপর্য এই যে সাধুদের অবলম্বিত সম্যক দর্শন-জ্ঞান-চারিত্র অবলম্বন করে দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর (আচার্য ও উপাধ্যায়) সাহায্যে অর্হৎ বা জিনের আদর্শ সামনে রেখে সেই সিদ্ধাবস্থা লাভের জন্য আমার চিত্তও যেন ধাবিত হয়। জৈন সিদ্ধান্তে সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্রের দ্বারাই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা যায়। সম্যক দর্শন সত্য শ্রদ্ধা বা বিবেক দৃষ্টি। পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানবার ইচ্ছা। সম্যক জ্ঞান সত্যজ্ঞান। সম্যক দর্শনেই পদার্থের সত্য স্বরূপ জ্ঞাত হয়। সম্যক চারিত্র—সংযম, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও শুদ্ধ আচরণ। তাই এই নমস্কার সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র রূপ 'ত্রিরত্ন' গ্রহণের অঙ্গীকৃতি।

সাত

পাওয়াপুরী

বৌদ্ধদের যেমন কুশীনগর জৈনদের তেমনি পাওয়া। কুশীনগরে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন, পাওয়ায় মহাবীর। কুশী-নগরে না এলে তাই যেমন বৌদ্ধদের তীর্থ-যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না, পাওয়ায় না এলে তেমনি জৈনদের তীর্থ-যাত্রাও অপূর্ণ থাকে।

পাওয়ার প্রাচীন নাম কিন্তু অপাপা যেন পাপের এখানে প্রবেশ নেই। বাস্তবেও তাই। জায়গাটি যেমন শান্ত, তেমনি পবিত্র। মহাবীরের নির্বাণ-ভূমি বলেই হয়ত।

কিন্তু পাওয়ার কথা বলবার আগে সংক্ষেপে এখানে মহাবীরের কথা বলে নেই। কারণ মহাবীরের নাম জানা থাকলেও মহাবীরের জীবন-কথা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। বুদ্ধ-কথা সাধারণের মধ্যে যতটা ছড়িয়ে পড়েছে মহাবীর-কথা ঠিক ততটা নয়। অথচ বুদ্ধ ও মহাবীর এঁরা দু'জনে প্রায় একই সময়ে একই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রও ছিল প্রায় এক।

আমরা যেদিনের কথা বলছি সে সময়ে লিচ্ছবী গণতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীতে রাজত্ব করছিলেন শ্রীমন্ মহারাজ চেটক। চেটকের সুশাসনে বৈশালীর তখন সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। সেই সময় গণ্ডকী নদীর পশ্চিম তীরে ক্ষত্রিয়কুণ্ড বলে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল যেখানে জ্ঞাত ক্ষত্রিয়েরা বাস করতেন। এই জ্ঞাত ক্ষত্রিয়দের নায়ক বা নেতা ছিলেন রাজা সিদ্ধার্থ। মহাবীর এই সিদ্ধার্থের ঘরে রাণী ত্রিশলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্ট জন্মের ঠিক ৫৯৯ বছর আগে চৈত্র-শুক্লা এক ত্রয়োদশীতে। মহাবীর মাতাপিতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁর অগ্রজের নাম ছিল নন্দীবর্দ্ধন।

মহাবীর শৈশব হতেই সকলের প্রিয় ছিলেন। প্রিয় ছিলেন কারণ তাঁর জন্মের পূর্বে ত্রিশলা চোদ্দটি স্বপ্ন দেখেছিলেনঃ হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, সরোবর, সমুদ্র, দেববিমান, রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি—যার ফলে জাতক হয় রাজ-চক্রবর্তী রাজা নয়ত সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্কর হন। মহাবীরের জীবনে দ্বিতীয়টি সত্য হয়েছিল। তিনি সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্কর হয়েছিলেন।

মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম কিন্তু মহাবীর ছিল না, ছিল বর্দ্ধমান। যেদিন হতে মহাবীরের আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যেদিন হতে ত্রিশলা তাঁর আসবার দিন গুণছিলেন, সেদিন হতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। ধন ও ধান্যে পূর্ণ হয়েছিল কোষ ও কোষ্ঠ। সামন্ত-নৃপতিরা আনুগত্য জানিয়ে গিয়েছিল আপনা হতেই, বশ্যতা স্বীকার করেছিল তারাও যারা এতদিন বশ্যতা স্বীকার করে নি। অকারণ-লব্ধ নয় এই ঋদ্ধি। তাই সিদ্ধার্থ নবজাতকের নাম দিয়েছিলেন বর্দ্ধমান। তারপর এই বর্দ্ধমানই তাঁর কঠোর তপস্যা ও নির্ভয়তায়, ত্যাগ এবং তিতিক্ষায় মহাবীর আখ্যা লাভ করেন। মহাবীর অর্থাৎ বীরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। পরাক্রান্ত শত্রুকে জয় করা এমন কি আর শক্ত, তার চাইতে অনেক বেশী শক্ত নিজেকে

সম্মেতশিখর

তেজপাল মন্দিরের অভ্যন্তর, দেলওয়াড়া

মণ্ডপের ছাদ, বিমল বসহি মন্দির, দেলওয়াড়া

ক্রঞ্চম্

গিরনার শিখর

গোম্মটেশ্বর, শ্রবণ বেলগোল
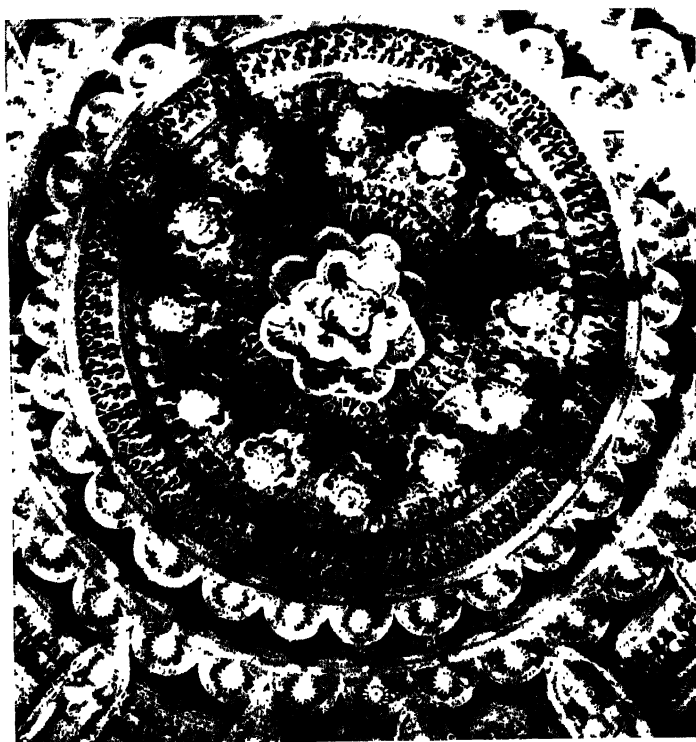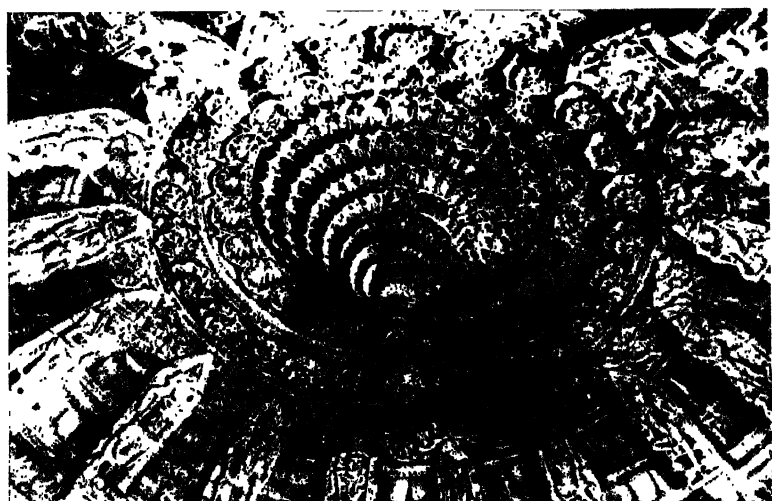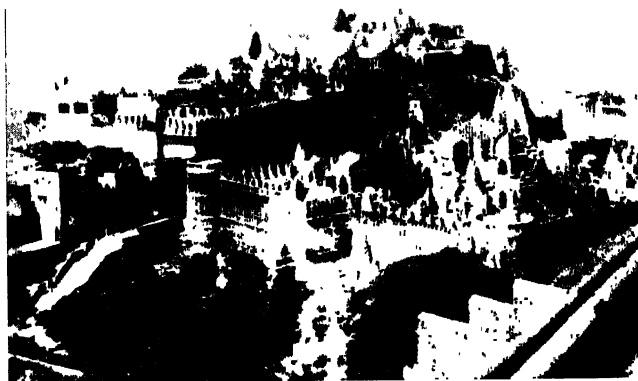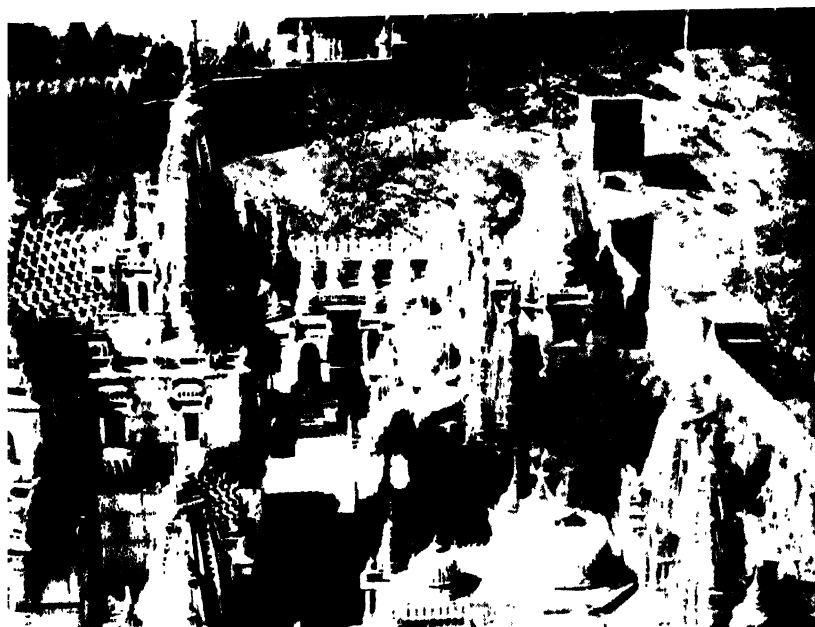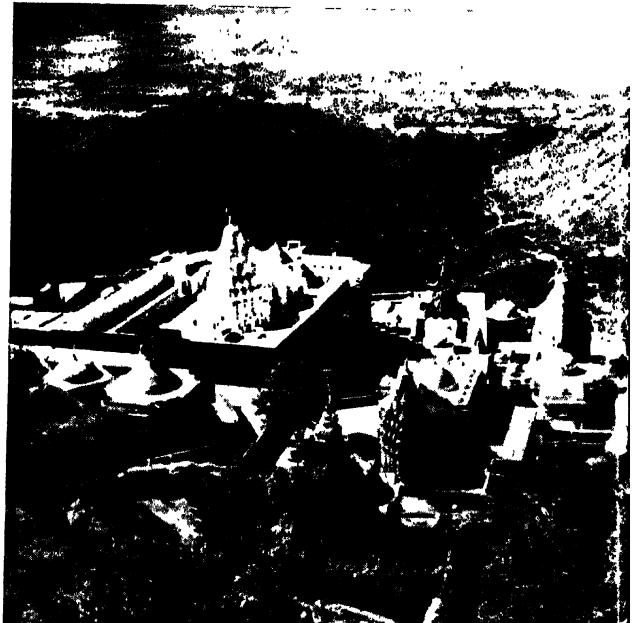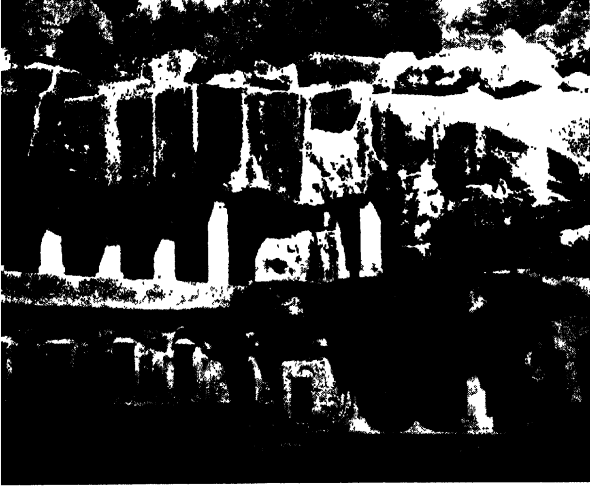
রাণী গুম্ফা, উদয়গিরি

জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি, খণ্ডগিরি

অলঙ্করণ, রাণী গুম্ফা, উদয়গিরি
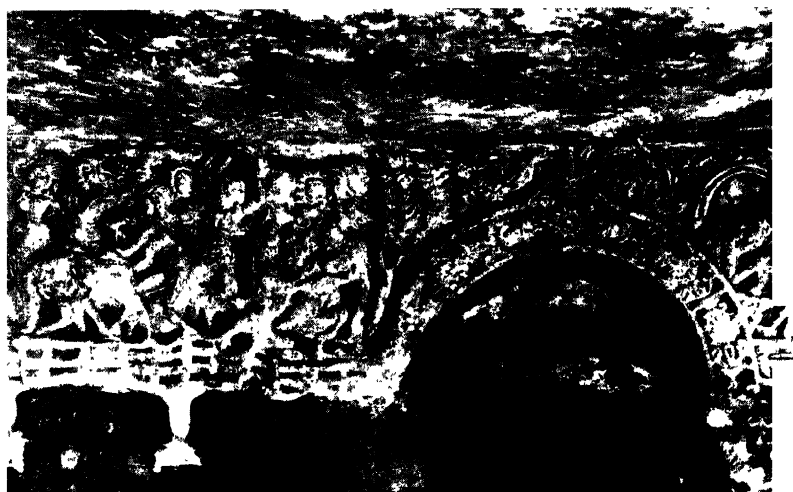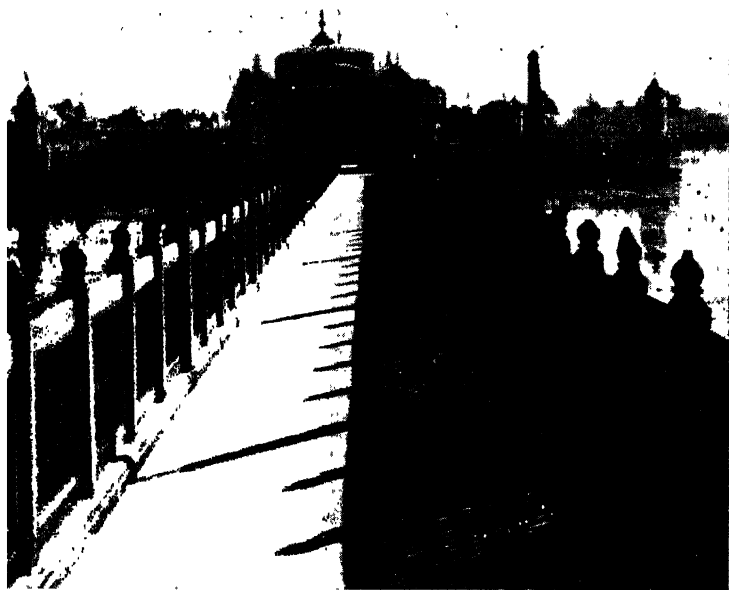
প্রবেশ-পথ, জল মন্দির

জল-মন্দির, পাওয়াপুরী
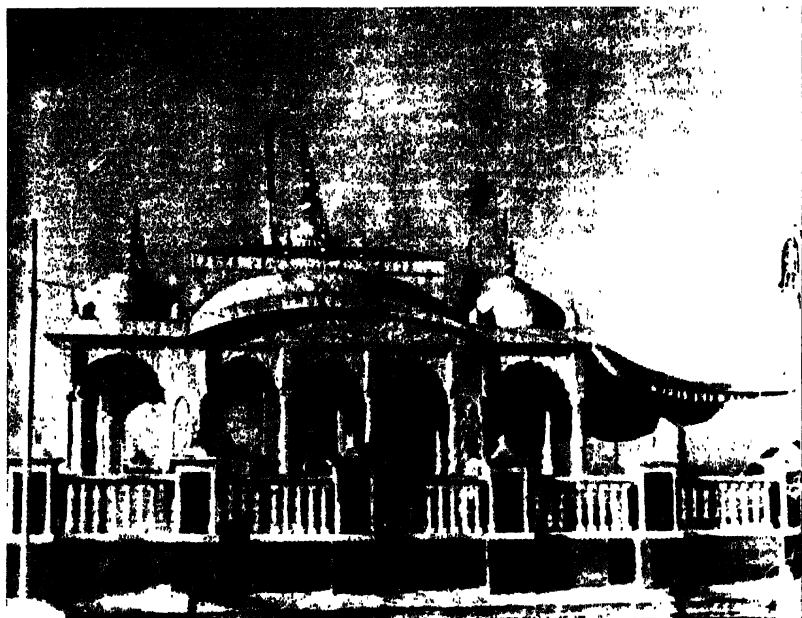
জয় করা। যিনি নিজেকে জয় করেন তিনি বীর—তাঁদের মধ্যেও আবার যিনি সকলের অগ্রগণ্য তিনিই মহাবীর।

বর্দ্ধমানের শৈশব জীবনের দু'একটা নির্ভয়তার কাহিনী ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না, তবে তিনি যে আজন্ম উদাসীন ছিলেন তা বোঝা যায় যে ভাবে ত্রিশলা সামন্তরাজ সমরবীরের মেয়ে যশোদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখতে চেয়ে ছিলেন। মহাবীরের প্রিয়দর্শনা নামে একটী মেয়েও হয়েছিল। তবে ভিন্ন মতে তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন, বিবাহই করেন নি। কিন্তু সে যা হোক, তিনি মাতাপিতার কষ্ট হবে বলে তাঁদের জীবিত কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। এমন কি তাঁদের মৃত্যুর পরও জ্যেষ্ঠ নন্দীবর্দ্ধনের আগ্রহে আরো দু' বছর ঘরে রয়ে গেলেন। তবে সে দু'বছর তিনি ঘরে থেকেও শ্রমণের মতো কঠিন জীবন যাপন করেছেন ও কল্পতরু হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থী-প্রত্যর্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। সে বিতরণ আবার এমনি যে যখন তিনি সম্পূর্ণ অকিঞ্চন হয়ে একটীমাত্র দেবদূষ্য বস্ত্র কাঁধে ফেলে গৃহ হতে অভিনিষ্ক্রমণ করে এসেছেন তখন আর কিছুই দেবার অবশিষ্ট নেই বলে সেই দেবদূষ্য বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে একজন ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে দান করলেন। বাকি আধখানাও যখন কয়েক মাস পরে ঋজু বালুকার তীর দিয়ে যাবার সময় বৃক্ষকন্টকে আটকে গিয়ে স্কন্ধ-চ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় তখন মহাবীর নীচু হয়ে তা আর তুলে নেন নি। সেই হতে তিনি সম্পূর্ণ নির্বস্ত্র হলেন।

মহাবীরের বারো বছরের প্রব্রজ্যা জীবনের ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই সময় তিনি পদব্রজে বিহার, বাংলা ও উত্তর প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং চাতুর্মাস্য ছাড়া কোথাও স্থায়ী ভাবে বসবাসে বিরত

থাকেন। রাত্রিবাসও তিনি নগরের বাইরে শ্মশানে উদ্যানে কি গাছের তলায়, নয়ত শূন্য পোড়ো ঘরে বা নির্জন চৈত্য বা দেবায়তনে করে থাকতেন। অর্থাৎ যতটা সম্ভব তিনি সংসারী মানুষের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবার চেষ্টা করতেন।

প্রথম চাতুর্মাস্যের একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার এখানে উল্লেখ করি। সেই তাঁর প্রথম চাতুর্মাস্য। মহাবীর মোরাক সন্নিবেশের নিকটস্থ দুইজ্জন্তদের আশ্রমে আশ্রমের কুলপতির আগ্রহাতিশয্যে বর্ষাবাস করতে এসেছেন। কিন্তু মহাবীর অধিকাংশ সময়ই ধ্যান-ধারণায় রত থাকেন তাই যে কুটির তাঁকে বাসের জন্য দেওয়া হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর দ্বারা হয়ে ওঠে না। কিন্তু আশ্রম-বাসীদের তা সহ্য হবার কথা নয়। প্রথমে তাঁরা নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে আন্দোলন করলেন। শেষে কথাটা কুলপতির কানেও উঠল। তিনি একদিন মহাবীরকে ডেকে বলেই ফেললেন যে পাখীরাও নিজের নিজের নীড়ের যত্ন নেয়, আর সে কিনা ক্ষত্রিয়-সন্তান হয়ে নিজের কুটিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না। হায়রে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী! সংসারের যে মমত্বকে তাঁরা পরিত্যাগ করে এসেছেন আশ্রমে তাঁদের সেই মমত্ব। মহাবীর তাই চাতুর্মাস্য সত্বেও সেইদিনই দুইজ্জন্তদের আশ্রম পরিত্যাগ করে অস্থিকগ্রামে শুলপাণি যক্ষায়তনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মহাবীর এই দীর্ঘ বারো বছর ধরে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ভেতর দিয়ে দেহবোধকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। এর জন্য কোনো মূল্য দিতেই তিনি সঙ্কুচিত হন নি। তিনি যেমন লজ্জা ঘৃণা ভয় পরিত্যাগ করেছিলেন তেমনি তাঁর ছিল না শীত কি গ্রীষ্ম, মান কি অপমান। শীতের দিনে অনাবৃত দেহে উন্মুক্ত প্রান্তরে তিনি যেমন সহজ ভাবে তীব্র বাতাসের মুখে অবস্থান করতেন, তেমনি সহজ ভাবে অবস্থান করতেন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে প্রখর সূর্যালোকে

উত্তপ্ত শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে। সাধারণ ভিক্ষুক কি উন্মাদ ভেবে কত দিন কত লোক তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, বিদ্ধ করেছে কাশ-শলাকায় কিন্তু কখনও তিনি তার প্রতিবাদ করেন নি কি নিষেধ সামান্য ভর্ৎসনা। সে সমস্তই তিনি অবিচলিত ভাবে সহ্য করেছেন। এমন কি কখনো চেষ্টাও করেন নি আমি নির্দোষ সে কথা প্রমাণ করবার। শুধু তাই নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে যাকে 'মারে'র অত্যাচার বলে অভিহিত করা হয়েছে সেই দৈবসৃষ্ট উপসর্গকেও তিনি হাসি মুখে সহ্য করেছেন। সেই উপসর্গ কতদিন তাঁকে প্রলোভিত করেছে, কতদিন তাঁর দেহে রোগ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে কিন্তু মহাবীরের কখনো এতটুকু সময়ের জন্যও আসন বিচ্যুতি হয় নি। শেষে উপসর্গ-সৃষ্টিকারী দেবতাও পরাস্ত হয়ে ফিরে গেছেন। এভাবে দেহবোধকে সম্পূর্ণ নির্জিত করে একদিন যখন তিনি দু'দিনের উপবাসের পর ঋজু বালুকা তীরে জম্ভীয় গ্রামের বাইরে এক শাল বৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসেছিলেন সেই সময় সহসাই তাঁর প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়ে গেল। তিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করে জিন অর্হৎ কেবলী সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হলেন।

মহাবীর ৩০ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ৪৩ বছর বয়স হতে সুরু হল তাঁর তীর্থঙ্কর জীবন। যে মধ্যমা পাওয়ায় তিনি নির্বাণ লাভ করেন, সেই মধ্যমা পাওয়ায় তিনি এসেছিলেন কেবলী হয়ে প্রথম ধর্মদেশনা দিতে। সেদিন মধ্যমা পাওয়ায় সোমিলাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু মহাবীরের উপস্থিতির এমনি আকর্ষণ যে লোক সেই যজ্ঞে উপস্থিত না হয়ে দলে দলে গিয়ে মহাবীরের ধর্ম-সভায় উপস্থিত হল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত ইন্দ্রভূতি গৌতম মহাবীরকে তর্কে পরাস্ত করে হীনমন্য করবার জন্য সশিষ্য তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর সামনে

যেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ-বিভূতিতে এমনি অভিভূত হয়ে গেলেন যে তর্ক করা ত দূরের, বেদের পরস্পর বিরোধী দু'টী বাক্য সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সংশয় ছিল, সেই সংশয় ব্যক্ত করে তিনি তাঁর কাছে তার সমাধান চাইলেন। কিন্তু আরো আশ্চর্য, মহাবীর বেদ-বাক্যকে মিথ্যা বলে অভিহিত করলেন না কি তার নিন্দা। তিনি সেই দু'টী বাক্যের সমন্বয় করে ইন্দ্রভূতি গৌতমের সংশয়ের নিরসন করলেন। ইন্দ্রভূতি গৌতম সেই সভাতেই সশিষ্য দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিলেন। এই ইন্দ্রভূতি গৌতমই তাঁর প্রথম শিষ্য এবং প্রথম ও প্রধান গণধর। জৈন সাহিত্যে ইনিই গৌতম বা গৌতম স্বামী নামে পরিচিত। ইন্দ্রভূতি গৌতমের পর অগ্নিভূতি, বায়ুভূতি, আর্যব্যক্ত, সুধর্ম, মণ্ডিত, মৌর্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মেতার্য ও প্রভাস সশিষ্য তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইন্দ্রভূতি ও এই দশজন মহাবীরের প্রধান শিষ্য বা গণধর রূপে পরিচিত।

মধ্যমা পাওয়া হতে বহির্গত হয়ে মহাবীর তারপর নির্গ্রন্থ ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন ও সাধু সাধ্বী শ্রাবক ও শ্রাবিকা ভেদে চারটি সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রাবক ও শ্রাবিকা তাঁর গৃহস্থ ভক্ত ও শিষ্য। তারপর তীর্থঙ্কর জীবনের পরিশেষে নির্বাণ লাভের ঠিক আগের চাতুর্মাস্যে সেই মধ্যমা পাওয়ায় আবার ফিরে আসেন। তারপর সেই মধ্যমা পাওয়ায় রাজা হস্তীপালকের লেখশালায় ৭২ বছর বয়সে ধর্মদেশনা দিতে দিতে কার্তিকী অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুখে মুখে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর নির্বাণ সময়ে সেইখানে কাশী ও কোশলের নয়জন মল্ল ও নয়জন লিচ্ছবী গণরাজ উপস্থিত ছিলেন। মহাবীরের তিরোধানে জ্ঞানের আলো অস্তমিত হ'ল বলে তাঁরা সেই অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্য প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে দ্রব্যের আলোক

প্রজ্বালিত করলেন। জৈনদের সেই হ'তে দীপান্বিতা রাত্রির আলোকসজ্জা।

পাওয়ার বর্তমান জল-মন্দিরটি যেখানে অবস্থিত সেইখানে মহাবীরের নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করা হয়। সেদিন সেখানে অবশ্য কোনো সরোবর ছিল না, কিন্তু মহাবীরের চিতাভস্ম নেবার জন্য এমনি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় যে যাঁরা চিতাভস্ম সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁরা সেইখানকার মাটি তুলে নিয়েই চলে গেছেন। এতে সেখানে যে প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল সেই গর্তই কালে বড় হয়ে বৃহৎ সরোবরের রূপ নিয়েছে। এই সরোবরের বর্তমান পরিধি এক মাইলেরো ওপর।

সরোবরের মাঝখানের জল-মন্দিরটি অনেক কালের হলেও মর্মর প্রস্তরের আচ্ছাদনটি খুব বেশী দিনের নয়।

মন্দিরটিকে ৬০০ ফুট দীর্ঘ পাথরের একটি সেতু দিয়ে স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রস্ফুটিত পদ্মবনের মাঝখানে হাঁসের পালকের মতো সাদা এই জল-মন্দিরটির শোভা সত্যিই অপূর্ব। বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতে একে পাথরের তৈরী বলে আর মনেই হয় না। মনে হয় একরাশ কুন্দফুল মহাবীরের সমাধিতে কে যেন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। এই মন্দিরের প্রধান গর্ভগৃহে অনেক কাল আগের মহাবীরের চরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত।

জল-মন্দিরের মতো গাঁও-মন্দিরটিও পাওয়ার একটা উল্লেখ-যোগ্য মন্দির। এইখানে ধর্মদেশনা দিতে দিতে মহাবীর কালগত হন। প্রবাদ, এই মন্দিরটি তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর অগ্রজ রাজা নন্দীবর্দ্ধন তাঁর স্মৃতিতে নির্মাণ করিয়ে দেন। মন্দিরটি বর্তমানাকারে খৃঃ পূঃ ৫০০ বছর আগের না হলেও নিঃসন্দেহে অনেক প্রাচীন। কারণ মন্দিরটির একটি প্রাচীর-লেখ হতে জানা

যায় যে শা-জাহানের সময় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে খরতরগচ্ছের একজন আচার্য জীনরাজ সূরীর সময় এই মন্দিরটির জীর্ণোদ্ধার করা হয়।

এ দু'টী মন্দির ছাড়াও এখানে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। এ ছাড়া যাত্রীনিবাস ও ধর্মশালা যে কত—বহুসংখ্যক যাত্রীদের এক সঙ্গে এখানে থাকবার কথা মনে করেই সেগুলি নির্মিত হয়েছে।

রাজগীর নালন্দা কি গয়ায় অনেকেই এসে থাকেন। সেখানে এলে পাওয়াতেও অবশ্যই আসবার। গয়া হতে নাবাদা হয়ে এখানে বাস আসে। রাজগীরের পথে বিহার লাইট রেলওয়ের বিহার-সরিফ ষ্টেশন হতেও এখানে আসা যায়। বর্তমানে পাওয়ায় বড় লাইন নিয়ে আসবার একটী পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সে যা হোক, বিহার-সরিফ হতে পাওয়ার দূরত্ব কিছুই নয়। মাত্র ৯ মাইল। গাড়ী ও টাঙ্গা সর্বদাই পাওয়া যায়।

জল-মন্দিরটি একবার দেখলেই দেখা হয় না। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। দূরের মাঠ, ইতস্ততঃ ছড়ান যূথভ্রষ্ট তালগাছ ও দিগন্ত-রেখায় রাজগীরের নীল পর্বতশ্রেণী মনকে কি এক অনাস্বাদিত ভাবে পূর্ণ করে দেয়। তখন কেমন যেন আপনা হতেই হারিয়ে যায় চেনা-অচেনার সীমারেখা। মন কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই মহাজীবনের কথা মনে করে চোখে জল ভরে আসে আর কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

হে মহাজীবন, তোমার চরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ।

এই বইটিতে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন শ্রীনরেন্দ্র সিংসিংহী, শ্রীলখমীচাঁদ শেঠ ও শ্রীহরি সিং শ্রীমাল। গিরনার শিখরের ছবি শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তোলা। প্রবেশ-পথ, জল-মন্দির বন্ধুবর শ্রীশেষকিরণ সুরানার। উদয়গিরি-খণ্ডগিরির চারখানা ছবিই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার। ছবিগুলি প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়ে এঁরা সকলেই লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এনলার্জমেণ্ট ও প্রিণ্ট ক্যামেরা এক্সচেঞ্জের। এর জন্য লেখক তাঁদের নিকটও ঋণী।